পথের পরিচয়

শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী

"নমামি প্রকাশ মন্দির"

প্রকাশক :

শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
নমামি প্রকাশ মন্দির
৮।২, গোপ লেন,
কলিকাতা-১৪

মুদ্রাকর :

শ্রীনীরেশনাথ ভট্টাচার্য্য
মেট্রোপলিটন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৭৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬৩

উৎসর্গ

স্বর্গতা জননী

সরোজিনী দেবীর

চরণোদ্দেশে।

ভূমিকা

মরণ-মন্ত্র জপতে জপতে একদা ঘর ছেড়েছিলাম। তারপর কখন সাথীদের সাথে পায়ে পায়ে তাল রেখে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছি, কখনো একাকী ছুটে চলেছি, হাঁপিয়ে উঠেছি শ্রান্তিতে, এলিয়ে পড়েছি পথের ধারে, সাথীর দরদভরা স্পর্শে আবার উঠে সুরু করেছি পথ চলা। এমনি ভাবে চলে চলে এসে পড়েছি জীবন পথের শেষ প্রান্তে। মহাকালের কোলের মাঝে সীমাহীন সুপ্তিতে ঢলে পড়ার আগে মন চায় ফিরে চাই পিছে ফেলে আসা পথের পানে। কত আবেগ, কত উৎসাহ, কত ক্লান্তি, কত অবসাদ, কত প্রাণ, কত প্রেরণা, কত অবিশ্বাস, কত প্রতারণা ভিড় করে আছে পথের বাঁকে বাঁকে। কত সাথী দুর্গম পথের অজানা গহ্বরে রচনা করেছে অন্তিম শয্যা,—কতই না তাপসের নিভৃত সাধনা ব্যর্থতার ব্যথায় মুসড়ে পড়েছে পথের ধারে, কত সম্ভাবনাময় সমর্পিত জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়েছে স'রে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে সবার অজ্ঞাতসারে। তাদের কথা বলতে চাই। তাই আজ ফিরে চাই অতিক্রান্ত পথের পানে—অজানার অন্ধকারে যতটা পারি করতে চাই আলোকসম্পাত, সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই আমার পথের পরিচয়।

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬০

বিনীত—
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী।

পথের পরিচয়

এক

কৃষ্ণের বিরোধিতা করতে করতে আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটল। আমার দাদা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বিপ্লবদলের একজন বিশিষ্ট সক্রিয় সদস্য। রাজসাহীতে পাঠ্যাবস্থায় যে ঘরটিতে আমরা থাকতাম সেই ঘরে সময়ে অসময়ে নানা চেহারার—নানা বচনভঙ্গির লোকের আমদানী হত। এরা যে বিপ্লবী তা'তে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। এদের রং বেরংএর কথার ঢং, আর চাল-চলনে যেমন কৌতুক আর কৌতূহল মনে জাগতো, তেমনি বিরক্তি আর তিক্ততায় ভরে উঠতো মন। পড়াশোনায় ভাল ছেলে ছিলাম। দাদার বন্ধুদের আচমকা আবির্ভাবে পড়াশোনার ক্ষতি হোতো যথেষ্টই। তার উপর রাত দুপুরে দাদার অর্ডার 'যা—বাজারে যা, চিড়ে মুড়কি কিনে আন্,—জল নিয়ে আয়—বিছানাটা ছেড়ে দে"—এই প্রকার হাজার রকমের দাবী মেটাতে হোত। কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতাম—এবার মরে যেন বড় ভাই হই—আর দাদা হন যেন আমার ছোট। সবার উপরে সেরা ফ্যাসাদ জুটেছিল দাদার ধূমপানের আগ্রহ। হোলি কালী, জুয়েল, হাওয়াগাড়ী, রকম বেরকমের সিগারেট কিনে এনে দিতে হত। দলের প্রধানদের লুকিয়ে বেশ টানতেন তিনি। কিন্তু কি জানি কোন্ হিতৈষী বন্ধু যেন দাদাকে বলেছিলেন—সিগারেটে বুক আর গলায় দোষ জন্মে,—সনাতন হুঁকো টানা বেশ নিরাপদ। ব্যস্!—আর যায় কোথা! আজ্ঞাবাহী অনুজ যখন সামনেই আছে,—তখন হরদম তামাক সাজ। দাদার নির্দেশ ছিল "ঘরে আর কেউ থাকলে হুঁকো

নিয়ে ঘরে ঢুকবিনা।” রাগের মাথায় একদিন দাদাদের দলের নেতা যোগেনদার সামনেই তামাক সেজে এনে হুঁকোটা দাদাকে বাড়িয়ে দিলাম। ঘরে ঢুকতেই আড়চোখে চেয়ে দেখি দাদা চোখের ইংগিতে বারবার নিষেধ জানাচ্ছেন—আমি গাল ফুলিয়ে নিবিষ্টচিত্তে কোল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে এগিয়ে চলেছি,—দেখেও দেখিনা। হুঁকোটা বাড়িয়ে দিতেই যোগেন দা ভ্রূ-কুঁচিয়ে দাদার দিকে চাইলেন—দাদা একই মুহূর্তে শীতাতপ অনুভব করতে লাগলেন। নেতার দৃষ্টির সম্মুখে শীতে ঠক্ ঠক্ কাঁপছিলেন, আর উত্তাপ মজুত রইল আমার জন্যে। একেবারে অর্ধনারীশ্বর—নারী যোগেন দার কাছে আর ঈশ্বর আমার বেলায়। জ্যোতিবাবু যাবার পরই দাদার তাপ মাপ ছাড়িয়ে গেল,—তিনি আমাকে পশুবৎ প্রহার করলেন। কিন্তু সেই দিন থেকে দাদা ধূমপান একদম ছেড়ে দিলেন।

দাদার আর তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের ফরমাইসের বহরে আমার মন একদম চটে গিয়েছিল। এর উপরে দাদার বন্ধুদের কেউ যখন আমাকে দলে ভিড়াবার জন্য ধর্ম আর রাজনীতির চর্চা করতে আসতেন,—কড়া কড়া বাৎ শুনিয়ে দিতাম। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে বলতাম—খুন ডাকাতিতে দেশের কাজ হয়—এ আমি বিশ্বাস করি না—করি না—করি না। ব্যস্! কিন্তু বিপদ হল এদের মধ্যে কাউকে কাউকে আবার খুব ভালও লাগতো। বেশ শান্ত, স্নিগ্ধ, হাসিমাখা মুখ। উপযাচক হয়ে আমার পড়ায় সাহায্য করেন—উন্নত ধরণের কথা বলেন—কথায় আছে শিক্ষা আর প্রতিভার ছাপ।

এই দিক দিয়ে আমার মন বেশী আকর্ষণ করেছিলেন শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ,—যাঁকে দাদারা ডাকতেন রাজেন বাবু, চশমা, ফ্রেঞ্চকাট আরও কত কি নামে। এ ছাড়া আরও যাঁরা আমার মনের উপর সুস্পষ্ট ছাপ রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রদাস ভট্টাচার্য্য ওরফে

জ্যোতিবাবু, ৺প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনরেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য, শ্রীজীবন কুমার ঠাকুরতা ওরফে লেংড়ু, শ্রীঅমৃতলাল সরকার ওরফে পরেশবাবু, আর শ্রীসুরেশচন্দ্র ভরদ্বাজ ওরফে পালোয়ান। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে পণ্ডিত, শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীমনোরঞ্জন গুহ আর শ্রীহংস গোপাল আগরওয়ালাকেও বেশ ভালই লাগতো। এই ভালো লাগাই কাল হ'ল। মুখে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যা' তা' বলে তর্ক চালাতাম,—আর মনে মনে তাদের পুজো করতাম। বেশ বুঝেছিলাম এ পথে পা বাড়ালে সর্বনাশ অনিবার্য। বুদ্ধি হুঁসিয়ারীর গণ্ডী এঁকে দিত দিনের পর দিন,—কিন্তু কিশোর বালকের আবেগ-চঞ্চল মন কিসের এক দুর্নিবার আকর্ষণে গণ্ডীর বাধা অতিক্রম করে বিপ্লবীদের যাত্রাপথের সাথী হত। প্রবোধদা সামনে এলেই আমার অন্তর উদ্বেলিত হত। টকটকে ফর্শা চেহারা, বীরের মত মূর্তি, জীবনে একদম বেপরোয়া। মলিনতার স্পর্শমাত্র ছিল না তাঁর মনে। তাঁর উদার উন্মুক্ত হৃদয় সহজেই করেছিল আমার হৃদয় জয়। নলিনী ঘোষ ওরফে রাজেনবাবুর কাব্যানুরাগ, জীবনদা'র জ্ঞানের তৃষা আর নরেনদা'র রসলিপ্সার প্রতি আমার আকর্ষণ অজ্ঞাতসারে আমার উপর বিপ্লবী প্রভাব বিস্তার করছিল।

বেশ মনে পড়ে এই সময়টার কথা। টুকটাক কাজ কর্ম'ও করছি, রিভলভারও লুকিয়ে রাখছি। কিন্তু আকারে ইঙ্গিতেও যদি কেউ বলেছেন আমি দলেরই সভ্য, অমনি মহামারী ব্যাপার। ভয়ঙ্কর চটিতং। আবোল তাবোল বকে প্রমাণ করতে চেয়েছি বিপ্লবীরা একদম বাজে,—সরকার ওদের দমন চেষ্টায় দেশের মঙ্গলই করছেন। আমার অবস্থাটা বুঝে নলিনীবাবু বোধ হয় মনে মনে হেসেছিলেন। আদেশ দিয়েছিলেন কেউ যেন আমাকে না ঘাঁটায়, আমার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করে। ব্যস্! কেল্লা ফতে! গুটী গুটী এগিয়ে আমি

একেবারে বিপ্লবীদের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দলভুক্ত সভ্যদের চেয়েও সক্রিয় হয়ে উঠলাম।—বইয়ের পর বই পড়তে লাগলাম,—প্রচণ্ড উৎসাহে ছাত্র মহলে প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করলাম। এবারে নিজ থেকে যেচেই কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ নিতে লাগলাম প্রবোধদা, —নরেনদাদের কাছ থেকে। নরেনদা আরও একধাপ এগিয়ে দিলেন আমাকে। ১৯১৫ সালে নাটোর মহকুমায় ধরাইল ডাকাতির পর একটী রিভলভার আর এক বাণ্ডিল বিপ্লবী ইস্তাহার— স্বাধীন ভারত"—রেখে দিলেন আমার কাছে। আমি তখন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাড়ীতে থাকি। বললেন—ধরা পড়লে নির্ঘাত পাঁচ বছরের জেল। আমি সভ্য নই—তবু এতখানি দায়িত্ব দিয়ে নরেনদা আমাকে বিশ্বাস করেন- এটা ভেবে বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম নিশ্চয়। অজ্ঞাতসারে ফাঁদে পা দিয়েছি এটা তখন ভাবতেই পারি নি।

পড়াশোনায় ভাল ছেলে ছিলাম—পড়ার আগ্রহও ছিল অপরিসীম। কোন পরীক্ষায় কোন পেপারে কেউ আমাকে অতিক্রম করেছে এটা জানলে ব্যথায় বুক ভরে যেত। তাই পড়ার রেসে ফার্ষ্ট প্রাইজ বরাবর আমিই পেয়েছি। ছিলাম শিক্ষকদের—চোখের মণি। ষোল বছরের একটা লিক্‌লিকে হ্যাংলা ছেলে যাকে প্রধান শিক্ষক বলতেন "Hat upon a stick"—ম্যালেরিয়ার অসীম কৃপায় চোয়ালের হাড়-যার বেরিয়ে গেছে,—বুকের হাড় গোনা যায়,—বিদ্যালয়ে আসে যে ক্যাংলা কাচের মত ময়লা ধুতি আর চাদর পরে,—সেই ছেলেটীকে শিক্ষকরা সকলেই পুত্রাধিক ভালবাসতেন। আমি অস্বাস্থ্যকর গৃহে থাকি বলে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ৺রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমাকে জোর করে তাঁর নিজের বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাসা ভাল ছেলের পড়াশোনা চুলোয় গেল পিছ্-দরজা দিয়ে দলে ঢুকে। তখন একই মাত্র চিন্তা কাজ—কাজ—আর কাজ।

গোপনতায় একটা ভয়ঙ্কর মাদকতা আছে, গোপন বিপ্লবী কর্মধারায় আছে অভিনব রোমান্স। আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম—আদর্শ ও কর্মের এই গোপন আকর্ষণে। উৎসাহ, উদ্দীপনায় হৃদয় উদ্বেল। কাজের চাপে পিষে মরতে চাইতাম আমি। তখন ১৯১৪ সালের শেষ ভাগ। বৈপ্লবিক আয়োজন জোরদার হয়ে উঠেছে। রাজশাহী শহরের উপর কাকার বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন "বিশ্বাস এণ্ড কোং" ছবির দোকানের মালিকরা। এই "বিশ্বাস এণ্ড কোং' ছিল বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা। দোকানটা ছিল বাহিরের আবরণ। কাকার বাড়ী ছিল অন্যতম প্রধান আশ্রয়। এখানেই আমি বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান আসামী ৺নগেন্দ্র দত্ত ওরফে গিরিজা বাবু, শ্রীসতীশ পাকড়াশী প্রভৃতি নামকরা বিপ্লবীদের দেখি।

হঠাৎ একদিন প্রাতে দেখা গেল কাকার বাড়ী ঘিরে আছে একদল লাল পাগড়ী। এক বোঝা বিচালী আর কয়েকটী রিভলভারের কার্তুজ ছাড়া আর কিছুই পুলিশ সেখানে পেলনা। বিপ্লবীরা সাফ কেটে পড়েছে। বিশ্বাস কোম্পানীর আবরণীও উন্মোচিত হয়েছে। দোকান আছে—লোক নাই।

এদিকে প্রবোধদারা ছয়জন ধরাইল ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়েছেন। বেশ একটু থমথমে ভাব। দাদা চলে গিয়েছেন রাজসাহী থেকে কোলকাতায়। আমি ঐতিহাসিক চন্দ মহাশয়ের বাসা থেকে এসে পড়েছি হনুমানজির আখড়ায়। এসে দেখি শুধু একটা ঠাকুর দেবতাদের আখড়া নয়,—বিপ্লবী ঠাকুররা পাড়া জুড়ে আখড়া সাজিয়েছেন,—আর তার মূল ঠাকুর হচ্ছেন ঠাকুরতা। আমাদের আত্মীয় শ্রীপ্রবোধ মৈত্র আর তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণদাস বর্মন দলের বিশিষ্ট সভ্য। জীবনকুমার তাঁদের বাসার কাছেই একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। জীবনদা'র

ঘরই এখন উত্তর বঙ্গের হেড্ কোয়ার্টার। আর আমার ঘর হয়ে পড়ল বিশিষ্ট কর্ম কেন্দ্র।

আমি তখন ফুল ফোর্সে কাজ করে যাচ্ছি। আমার প্রধান কাজ ছিল দলের সভ্য সংগ্রহ করা। নাম করা ভাল ছেলে। তার উপরে History of the Dutch Republic, ম্যাৎসিনির অটোবায়োগ্রাফি, Garibaldi and the Thousand, War of American Independence, Nepoleon Bonaparte, History of French Revolution, সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা,' সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, অযোধ্যার বেগম, ছত্রপতি শিবাজী, Speeches and writings of Dadabhai Nauroji, রমেশ দত্তের India under Early British Rule প্রভৃতি দেশ বিদেশের বহু গ্রন্থ থেকে বাছা বাছা অংশ গুলো মুখস্থ করে নিয়েছি। সুতরাং শুধু ছাত্র কেন,—তাদের দাদাদেরও তাক্ লাগিয়ে দেবার বিদ্যা আমার আয়ত্বে এসেছিল। এই সব পড়াশোনায় উৎসাহ দিতেন জীবনদা আর নরেনদা। নলিনীবাবুর সাথে করতাম রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা। চার দিক দিয়েই আমার শিক্ষা superficial হলেও বেশ চটকদার হয়ে উঠেছিল। আর এই জৌলুসের সাহায্যেই—ছাত্র মহলে প্রভাব বিস্তার করা আমার পক্ষে বেশ সহজ হয়েছিল।

আমার এক ক্লাস উপরে পড়ত মনি মিত্র আর হিলির প্রতাপ মজুমদার। এঁরাও পড়াশোনায় খুব ভাল ছেলে—আর দলের সভ্য ছিলেন। প্রতাপ বাবু একটু বেশী academic ছিলেন, আর মনি ছিল practical. তাই মনি দল-সংগঠন ব্যাপারে—প্রতাপ বাবুর চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। রাজসাহীর বহু ভাল ছেলেকে মনি দলে এসেছে। তারা পরবর্তী কালে বিপ্লবী দলে নির্ভর যোগ্য কর্মীরূপে গণ্য হয়েছে—দলের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

আমাদের বন্ধু শ্রীব্রজগোপাল মজুমদারও দলে ভিড়েছেন। এমন আমুদে লোক খুব কমই দেখা যায়—সরস কথায় নরেনদা'র জুড়িদার। শ্রীসুরেশ নিয়োগী ওরফে ভজাবাবুও এই সময় দলে ঢোকেন। এঁর চেহারা ও চরিত্র উভয়ই ছিল সুন্দর।

আমার প্রথম রিক্রুট হল আমাদের গ্রামের শ্রীভূপেন্দ্রনাথ অধিকারী আর শ্রীকমলাচরণ ব্যানার্জি। আশৈশব এরা আমার খুবই প্রিয় ও অনুগত ছিল। প্রধানত: ভূপেনের চেষ্টাতেই আমাদের গ্রামের শাখাটী বেশ দানা বেধে ওঠে। তার চেষ্টাতেই সুধীর সাহা, সতীশ সাহা, পঞ্চা পাল, ভবেশ রায়, বিনয় ঘোষাল, রমেশ মজুমদার, ভূপেন মজুমদার, বিভূতি মজুমদার প্রভৃতি দলভুক্ত হয়—আর আমার সহকারীরূপে সমবেত হয়। এদের মধ্যে সুধীর ও সতীশ ইহজগতে আর নাই। কিন্তু সাহসে, কর্ম্মকুশলতায় এদের জুড়ি ছিলনা এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা আর আনুগত্য। তাই ওদের কথা স্মরণ করতে আজও আমার অন্তর হাহাকারে ভরে উঠে।

ভূপেন বহুদিন আমার একান্ত সুহৃদ ও সহকর্মীরূপে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। তার পর বে থা করে সংসারী হয়েছে। এখন একটী কয়লাখাদের এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। আর কমলা এখন ষ্টেশন মাষ্টার। ভবেশ প্রতিভাবান কৃতী ছাত্র ছিল। আজ সে ভারত সরকারের একজন বড় চাকুরে। এক সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ছিল সে এবং সায়েন্স কলেজে আচার্য রায়ের কাছেই থাকতো। যদিও গণজীবন থেকে সে এখন বহুদূরে সরে গিয়েছে তবু তার নিরহঙ্কার সুমধুর পাণ্ডিত্য আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দান করে।

বুদ্ধি, বিবেচনা কর্মকুশলতা আর চরিত্র-মাধুর্যে বিনয় ভূপেনের পরেই গ্রামের ছেলেদের নেতৃত্ব লাভ করেছিল। বহুদিন পর্যন্ত সে, ভূপেনের

ছোট ভাই শচীন আর বিভূতি গোপন বিপ্লবী আন্দোলনে আমার সহকারী ছিল। এখন তারা কোন রকমে সংসারের বোঝা টেনে চলেছে।

এইতো গেল গ্রামের কথা। শহরেও তখন আমার দলগঠন চলেছে পূর্ণগতিতে। আমার সহপাঠী ও প্রিয়বন্ধু বিধু মৈত্র আর মনি সরকার দলে ভিড়েছে। বিধুর ঘরে আমার আড্ডা ছিল। সেই সূত্রে নীরোদ সান্যালও কিছু কিছু জানতো আমাদের কথা। আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় ৺রমাপ্রসাদ চন্দের দ্বিতীয় পুত্র অমূল্য, পাড়ার আর একটা ছেলে বরদা এই সময়েই দলভুক্ত হয়। আমার সহপাঠী ও বন্ধু জ্যোতিশ সরকার ও দ্বিজেন চক্রবর্তীও আমাদের দলে ভিড়ে। জ্যোতিশ উৎসাহী ও কর্মকুশল ছিল। পরে সে ব্রহ্মদেশ ও বিহারে দল গঠনে এবং গণ-আন্দোলনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। আমার সহপাঠী গৈলার ক্ষিতীশ সেন, অতুল সেন, জ্ঞানেন্দ্র কুণ্ডু, শৈলেন সেন, জয়নাথ সাহা প্রভৃতিও এই সময় আমার সান্নিধ্যে আসে। অতুল আর শৈলেন এখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারী চাকুরে। আর কে কোথায় আছে ঠিক জানিনা।

উপরে যে সব বন্ধু আর সহকর্মীর কথা বলেছি তাদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে আজ অমূল্যের কথা। মাষ্টার মহাশয়ের ছেলেদের মধ্যে অমূল্যই ছিল বোধহয় সব চেয়ে মেধাবী। কিন্তু মন ছিল তার অতিশয় ভাবপ্রবণ আর আদর্শবাদী। দেশ সেবার যে আদর্শ তরুণ বয়সে সে গ্রহণ করেছিল পরম নিষ্ঠায় সেই আদর্শের প্রতি অনুরক্ত থাকার ফলে সংসারে সে প্রবেশ করতে পারেনি। নাম করা দেশ নেতাদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে রকম বেরকমের ক্ষুদ্রতা দেখে আৎকে উঠেছে, নিজকে খাপ খাওয়াতে পারেনি পরিবেশের সাথে। তার অন্তরের পূজা লুটিয়ে পড়েছে ধূলায়।—তাই ব্যর্থতার জ্বালা সইতে না পেরে জীবনের ছেদ টেনেছে] সে গত বৎসর দিল্লীতে

আত্মহত্যার মাধ্যমে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে অমূল্যের একান্ত আগ্রহে একরাত আমি তাদের বালীগঞ্জ বাড়ীতে তার ঘরে কাটাতে বাধ্য হয়েছি। বার বার চেষ্টা করেছি তার মনকে বাস্তব ভূমিতে নিয়ে আসতে। বুঝাতে চেষ্টা করেছি হতাশায় ভেঙ্গে পড়া বিপ্লবীর স্বভাব নয়—এতে জীবনদর্শনের অভাবই প্রমাণ করে। অমূল্যের ইদানিং কালের অকৃত্রিম সুহৃদ নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী কবিরাজ শ্রীকমলাকান্ত ঘোষ মহাশয়ও বহুচেষ্টা করেছেন তার মনকে অবসাদ বিমুক্ত করতে। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে,—অমূল্য নিজ হাতে করে গেল তার ব্যর্থ-জীবনের অবসান। মর্মান্তিক!

রাজসাহীর বিপ্লবী দল সংগঠনে আমার আর এক সহপাঠী বন্ধুর অপূর্ব অবদান ছিল। তার নাম তারাদাস ভট্টাচার্য্য। আমার সহপাঠী বলায় তারাদাস হয়তো ক্ষুব্ধ হতে পারে। কারণ সে ছিল শ্রেণীর সনাতন ছাত্র। একই বিদ্যালয়ে পড়লে সে আমার কাকা, দাদা, ছোট ভাই সকলেরই সহপাঠী হতে পারত। একেবারে মূর্তি-মান ধূমকেতু। বিদ্যালয়-গগনে কালেকশ্মিনে তার উদয় হত। কিন্তু যখন হত—শিক্ষকরা তার পুচ্ছের দাপটে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তেন। তারাদাসের সম্পর্কে একটা গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছিনা। একবার বোধ হয় ষাণ্মাষিক পরীক্ষায় সে একজন সহপাঠীর খাতা টেনে নিয়ে নকল করছিল। একজন শিক্ষক খাতা ধরে প্রধান শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট করতে গেলেন। এই অবসরে তারাদাস একখানা সাদা খাতার কভারে লিখে রেখে গেল—That shala who has cought my paper—if God help me, I shall cut down his head—Taradas. প্রধান শিক্ষককে সাথে নিয়ে মাষ্টার মশাই হলে ঢুকে তারাদাসকে আর পেলেন না। কিন্তু স্বয়ং তারাদাসের শ্রীহস্ত লিখিত অপূর্ব বাণী পাঠ করে একদম ঘাবড়ে

গেলেন। তিনি আর একা একা চলা ফেরা করতেন না। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তারাদাসকে তাড়িয়ে দেবেন বলে তর্জন গর্জন করলেন বটে, -কিন্তু মাত্র দুই টাকা ফাইন করে ছেড়ে দিলেন। ফাইনের কথা বলতেই তারাদাস গেল ক্ষেপে। প্রথমে অত্যন্ত বিনীত ভাবে ফাইন মাপ চাইল তারাদাস। প্রধান শিক্ষক ধম্‌কে দিলেন। ছুটীর পর দেখা গেল তারাদাস ক্লাসের একখানা বেঞ্চ ঘাড়ে করে বেরুচ্ছে। হেডমাষ্টার ছুটে এলেন। তারাদাস নম্রভাবে জানালে—"বেঞ্চিটা বিক্রী করে ফাইন দেব স্যার্!" অগত্যা তার ফাইন মাপ্‌ হয়ে গেল।

এ হেন মেধাবী ছাত্র তারাদাস দেহে মনে ছিল অফুরন্ত কর্মের উৎস। স্কুল কলেজের ছাত্ররা তাকে অসম্ভব ভালবাসত,—গুরুর মত মানত। তার এই জনপ্রিয়তা পুরোপুরিই লাগিয়েছিল সে বিপ্লবীদল সংগঠনে। সফলও হয়েছিল আশাতিরিক্ত ভাবে। পরোপকারী, উদার, নির্ভীক ও প্রাণবন্ত ছিল তারাদাস। আজ সে বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ হোমিও-প্যাথ ডাক্তার। তার প্রতিভা বিকসিত হয়েছে চিকিৎসা বিদ্যায়।

তারাদাসের প্রভাবেই দলে আসে পুঠিয়ার জমিদার গোষ্ঠির ৺সত্যরঞ্জন ও জ্ঞানাঞ্জন লাহিড়ী ভ্রাতৃদ্বয়—আর তারাদাসের প্রতিবেশী সুধাংশু ওরফে চেঙ্গ চৌধুরী। এদের নিষ্ঠা, ত্যাগ আর দলানুরক্তি অনুশীলন সমিতির সম্পদ ছিল। জ্ঞানাঞ্জন ওরফে আন্দু আর চেঙ্গ ছিল তারাদাসের মতই উদার, নির্ভীক এবং মিলিটারী মেজাজের। একদম বেপরোয়া। কোন ক্ষুদ্রতা, কোন মলিনতা ছিলনা এদের চরিত্রে। আজও এরা তেমনি হাসিমুখে জনসেবার কাজে এগিয়ে আসে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি রাজসাহীতে অনুশীলন দলের পুরোভাগে এসে গেলাম। এর কারণ বোধ হয় দলের প্রধান আড্ডা হনুমানজির আখড়ায় থাকতাম আমি। সেখানে শ্রীজীবন ঠাকুরতা, শ্রীঅমৃত সরকার ওরফে পরেশ বাবু, শ্রীসুরেশ ভরদ্বাজ ওরফে

পালোয়ান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে এসে আমাতেও নেতৃত্বের ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছিল। ৺শৈলেন্দ্র মৈত্র ওরফে বিশুদা ৺নকুল সরস্বতী, শ্রীযুত শশী সান্যাল, অরবিন্দ সান্যাল এঁরা সকলেই আমার দাদার প্রভাবে দলে ভিড়েছিলেন। সকলকেই আমি দাদার মত শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু দলের বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে ধাপে ধাপে আমি এগিয়ে গেলাম এঁদের সকলের সামনে।

এই সময়ই জানতে পারি শহরে আর একটী বিপ্লব দলও সক্রিয়। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘটক, শ্রীক্ষিতীশ মজুমদার ওরফে শম্ভুদা শ্রীকালীপদ চৌধুরী, শ্রীশরদিন্দু চক্রবর্ত্তী ওরফে তিনু দা, আমার বন্ধু শম্ভু ও শিবু গাঙ্গুলী এই দলের সভ্য। শিবু, শম্ভু-ও হনুমানজীর আখড়ায় থাকত। অনুশীলনের বেড়া জাল ছিল এখানে। ওরা যেন কেমন করে ছিটকে পড়েছিল—উত্তরবঙ্গ সমিতিতে। অথচ ওদের ভাই সরোজ আমার অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয় সহকর্মী ছিল।

১৯১৫ সালের প্রথম ভাগে—বোধ হয় এপ্রিলে একটা কাজের ভার নিয়ে—কোলকাতায় যাই। দাদা তখন কোলকাতায় একটা মেসে থেকে সিটি কলেজে পড়েন। সেখানেই আমি উঠি। সেখানে দেখা হল নলিনী ঘোষ ওরফে রাজেন বাবুর সাথে। রাজেন বাবু আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন এবং ঠাট্টা করে বললেন এবারে তুমি দলের সভ্য তো? উত্তরে আমি জানালাম "One is known by the company he keeps."

জ্যোতিবাবুকেও এখানে দেখি। তাঁকে দেখে আমি খুশী হই। কারণ রাজসাহীতে যখন তিনি ছিলেন তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। হাসিমুখ অথচ বাহুল্য কথা নাই,—একটা নায়কোচিত গাম্ভীর্য ছিল তাঁর চরিত্রে। এই ভাবটা দেখেছি অসমসাহসিক, দলের দুর্দান্ত অগ্নীনায়ক অমৃত সরকারের মধ্যে। দাদার এই অখিল মিস্ত্রির লেনের মেসেই আমি চট্টগ্রামের মোহিনী ভট্টাচার্য্য ওরফে মাস্থ যশোরের

প্রবোধ বিশ্বাস ওরফে কালু, ঢাকার শিশির ঘোষ ওরফে ব্রাহ্ম এবং নরেন ব্যানার্জী ওরফে সায়েন্টিষ্ট প্রভৃতির সাথে পরিচিত হই। গোয়েন্দা বিভাগের সর্বময় কর্তা—ডেপুটী সুপার বসন্ত চাটুয্যের হত্যাকারী দলে প্রথম তিনজন ছিলেন। মোহিনী ওরফে মানুদার সাথে আমি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম দেখতে যাই। সে যুগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ছিলেন বিপ্লবী দলের মহামন্ত্র উদ্গাতা। স্বামীজির অভীঃমন্ত্র, তাঁর কর্ম, ভক্তি, জ্ঞানের মিলনবানীর অমৃত ধারা—সঞ্জীবিত করেছিল বাংলার বিপ্লবী—জীবনকে। স্বামীজীর 'উত্তিষ্ঠতঃ, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—ছিল আমাদের প্রত্যেক বিপ্লবীর বুকে লেখা মহামন্ত্র,—আর এই মহামন্ত্রই স্থান পেত আমাদের গোপন বিপ্লবী ইস্তাহার 'স্বাধীন ভারতের' ও 'Liberty'র শিরোভাগে।

বিপ্লবীদের নবীন গীতার প্রথম শ্লোকই ছিল 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরাণ নিবোধত—Awake—Arise,-stop not till the goal is reached.'

চরিত্র গঠনে এবং মনের দৃঢ়তা সম্পাদনে স্বামীজির সব গ্রন্থই ছিল সেদিনে বিপ্লবীর কাছে বেদ। এ ছাড়া আর একটী মহামন্ত্র বিপ্লবী গীতার অন্যতম প্রধান শ্লোক ছিল। সেটী হচ্ছে—End justifies the means. এই নীতির সমর্থন পেয়েছিল বিপ্লবীরা লোকমান্য তিলকের গীতার ভাষ্য—'কর্ম-যোগ শাস্ত্রে।'

মানুদা ছিলেন চাটগাঁইয়া অর্থাৎ চট্টলের অধিবাসী। বেলুড়ে তিনি একজন 'ছাঁটিগাঁর' ব্রহ্মচারীর সন্ধান পেলেন। তারপর দুজনে যে দুর্বোধ্য বঙ্গভাষার আলাপ জুড়ে দিলেন তা বোধ হয় বাঙ্গলা ও বর্মী ভাষার জগা-খিঁচুড়ি। এঁদের কথার অর্ধেকটা থাকে গলার মধ্যে; আর অর্ধেকটা ছররার গুলীর মত তীব্র বেগে ছিটকে পড়ে বাহিরে। এক এক সময় আমার মনে হয় চট্টগ্রামের সকল নর-নারীই

বোধ হয় কম্পাউণ্ডারী পাশ। কম্পাউণ্ডাররা যেমন ডাক্তারদের 'Q' আর সিধে টান্ অথবা কিড়িমিড়ি দেখেই বুঝে নেন 'Quinine'—অর্থাৎ আগুক্ষর আর হিজিবিজি দেখেই ওষুদটীর নাম ঠিক্‌ঠাক্ ধরে নিতে পারেন—আমাদের চট্টলী ভ্রাতারাও তেমনি কথার প্রথমটা শুনে ধরে নেয় বক্তব্য। নৈলে নৈনাদ্দর শুনে কে বুঝবে নবীন মাতব্বর ?' মাহুদা মশগুল হয়ে ব্রহ্মচারীজির সাথে গল্প চালিয়ে যান, আর বোধ হয় কৃপা পরবশ হয়েই তাঁদের এই আলাপ-আলোচনাব অসহায় শ্রোতাটীর দিকে বার বার ফিরে চান। আমি ভাবি এওতো বাংলা ভাসা—বৈচিত্র্যেব অর্ঘ্যে সমৃদ্ধ করেছে বঙ্গ-ভাষাকে। তবে কোন প্রয়োজনে আসামের কথ্য ভাষা—যা' চট্টলের কথ্যভাষা অপেক্ষা সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে সহজ বোধ্য,—তা পেযেছে স্বতন্ত্র রূপ। ইংরাজ কি আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করার কথা ভেবেছে কখনো? না সামান্তের এই সমৃদ্ধি ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল থেকে বাংলার প্রভাব খর্ব করার কথাটাই প্রয়োজনরূপে দেখা দিয়েছে তার মনে?

প্রায় সাতদিন পর ফিরে গেলাম রাজসাহীতে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম কাজের মাঝে। দিনের বেলা পড়াশোনা করি। আর প্রায়ই রাতে নাটোর, পুটিয়া, গোদাগাড়ীতে দলের কাজে যাতায়াত কবি।

সেদিনের কথাগুলি স্মরণ করে আজ বিস্ময়ে মন ভবে ওঠে। অদ্ভুত মেধাবী বলে ছিল যার পরিচয়—সেই জিতেশের পড়াশোনা ভেসে গিয়েছে বিপ্লবী আগ্রহের বন্যায়,—লিক্‌লিকে ক্ষীণ দেহ নিয়ে সে অসম্ভব খেটে চলেছে দিন রাত। তবু যেন তৃপ্তি নাই। আরো চাই—আরো চাই। সজ্ঞানে যাদের ছায়া মাড়াতে চাইতাম না—তাদের সান্নিধ্য পেতে চাই সর্বক্ষণ। শ্রীযুত জীবন ঠাকুরতা, অমৃত সরকার, সুরেশ ভরদ্বাজ, মনোরঞ্জন গুহ, সতীশ পাকড়াশী, সতীশ দে প্রভৃতি ফেরারীদের কোন আদেশ নির্দেশ পেলে ধন্য মনে করতাম নিজকে।

এই সময়েই সারা বাংলা কেঁপে উঠল গোয়েন্দা কুল-তিলক বসন্ত চাটুয্যের হত্যা ব্যাপারে। গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়ে গেল। ফেরারী দলে লেগেছে মড়ক। কে কবে, কোথায় গঙ্গা-যাত্রা করেছেন তার হদিশ পাওয়া ভার। রাজশাহী শহরে প্রথমেই গ্রেপ্তার হলেন অপর দলের স্থানীয় নেতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘটক। তারপর ঐ দলেরই শ্রীক্ষিতীশ মজুমদার ওরফে শম্ভু দা। কিন্তু তৃতীয় আঘাত পড়ল অনুশীলন দলের উপর। আমাদের গ্রামের ৺অরবিন্দ সান্যাল ছিলেন Post-Box. কোলকাতার তল্লাসীতে তাঁর নাম পাওয়া যায় এক ফেরারী আড্ডায়। পুলিশ সেই সূত্রে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। অরবিন্দ দার সাথে যোগাযোগ ছিল—প্রবোধ দা'র (মৈত্র), কেষ্ট দা'র, ৺শৈলেন মৈত্র ওরফে বিষ্ণু দা'র, আমার বন্ধু জ্যোতীশ সরকারের আর আমার। জীবনদা তখন কোলকাতায়। উত্তরবঙ্গের চার্জে আছেন শ্রীসুরেশ ভরদ্বাজ ওরফে পালোয়ান। তাঁর নির্দেশ মত কেষ্টদা গা ঢাকা দিলেন। প্রবোধদাকে তিনি পাঠিয়েছিলেন বহরমপুরে। তাঁকে প্রেমতলী ষ্টীমার ষ্টেশনে নামিয়ে আনলাম আমি। তারপর পালোয়ানের নির্দেশে প্রবোধদাও হলেন ফেরারী। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই বিশুদা, জ্যোতীশ আর আমি গ্রেপ্তার হলাম ভারতরক্ষা আইনে। পরে জানতে পারি পুলিশী জুলুম সইতে না পেরে অরবিন্দদা স্বীকারোক্তি করেছিলেন।

কোলকাতার নাম করা গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর শশী ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে গ্রেপ্তার করেই জিজ্ঞাসা করলেন দাদা কোথায়। আমি জানালাম কোলকাতায় সিটি কলেজে পড়েন তিনি। ধমকে উঠলেন—ওসব ভূয়ো কথা। বললাম তবে আমি জানিনে। অবজ্ঞার হাসি আর ভ্রূকুটী মিশিয়ে তিনি বললেন—'পড়েছ, লাঠির চোটে পলায় গরু? লাঠির চোটেই তোমাদের ঘাড়ের বিপ্লবীভূত পলাবে।" সেদিন এই পর্যন্তই।

পুলিশ পরিবৃত হয়ে তিনবন্ধু এলাম জেলখানায়। আমার স্থান হল ফাঁসী ঘরের ঠিক সামনে যোল নম্বর সেলে। রাতে শুনলাম কে যেন ডাকছেন—ষোল নম্বর--এই যোল নম্বর। কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম—মনে হল বেশ চেনা স্বর! আবার প্রশ্ন—কে তুমি? উত্তর দিলাম "জিতেশ লাহিড়ী,—আপনি?" জবাব পেলাম 'মহলানবিশ—এখন অমৃত সরকার।" মহলানবিশ? পরেশ বাবু? চক্ষুধন?—তাঁর নাম অমৃত সরকার? তিনি ধরা পড়েছেন? আর আছেন আমারই পাশে আঠারো নম্বর সেলে। মনটা দমে গেল তাঁর গ্রেপ্তারের অবগতিতে—কিন্তু ভরসাও পেলাম প্রাণে—বান্ধবের সান্নিধ্যেই আছি—"রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ"—

পরেশ বাবুর কাছেই পরে জেনেছি চোদ্দ নম্বর আর বারো নম্বর সেলে আছেন মৈমনসিংহের ৺হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী আর অধ্যাপক প্রভাস দে।

দশ পনর দিন পর জেলারের সাথে শশীবাবু সেলে এসে দেখা করলেন। নির্জন কারাবাসের একটা ভয়ংকর বিপদ এই যে নির্জনতায় মন হাঁপিয়ে উঠে,—মানুষের সান্নিধ্য কামনা করে—তা' সে যেই হোকনা। এই সময় সংযম হারালে গালগল্পের মাধ্যমে অনেক কথা বেরিয়ে যায়। বিশুদা'র এমনি এক দুর্বল মুহূর্তের আলগা কথায় দুদিন আগে একটী সিপাহীর কর্মচ্যুতি ঘটেছিল। সে পাহারায় থাকা কালীন পরেশবাবু আর আমার কথা বিশুদা'কে গিয়ে বলেছিল। এই খবর পাবার পর থেকে পরেশবাবু সতর্ক করে দিয়েছিলেন আমাকে। সুতরাং আই, বি ইনস্পেক্টর শশীবাবু আমার কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারলেন না। ফলে আমাকে দালান্দা হাউসে পাঠাবেন বলে খুব হম্বি তম্বি করে গেলেন। সে সময় দালান্দাহাউসে ধৃত বিপ্লবীদের উপর কি রকম অমানুষিক নির্যাতন করা হত তা

আমার অজানা ছিলনা। সুতরাং মনটা একটু কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু আদর্শের প্রতি অচঞ্চল নিষ্ঠা মনে এনেছিল দৃঢ়তা, আর বিপ্লবী আগ্রহ মনে দিয়েছিল স্থির সঙ্কল্প। আরও দুইবার শশীবাবু দেখা করেছিলেন জেলখানায়। প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন সবই চালিয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি আমার সঙ্কল্পে ফাটল ধরাতে পারেন নি। অবশেষে একমাস পরে আমাদের তিনজনের অন্তরীণের আদেশ হল। বিশুদা হলেন স্বগৃহে অন্তরীণ; জ্যোতীশ মেদিনীপুর জেলায় আর আমার অন্তরীণের আদেশ হল জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি থানায়।

অন্তরীণ আদেশ ভঙ্গ করার সঙ্কল্প নিয়েই আমি রাজসাহী থেকে রওনা হলাম। নাটোরে কমলার সাহায্যে শ্রীসতীশ দে'র সাক্ষাত পাই এবং তাঁরই সাথে পাড়ি জমাই দিনাজপুরে। দিনাজপুর ষ্টেশনের কাছেই ছিল দলের আড্ডা। স্থানীয় সংগঠক ছিলেন শ্রীবিধু দে। কয়েকদিনের মধ্যেই আড্ডা বেশ জমকে উঠল। সেখানে এলেন তারিনী মজুমদার ওরফে ষ্টার, নিশি পাইন, প্রফুল্ল রায় ওরফে সর্দার, আমার বাল্যবন্ধু লালোরের মনি সান্যাল, কেষ্ট সাহা ওরফে জামাই, আর বিনায়ক রাও কাপলে ওরফে সত্যেন। কাপলে কাশী ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী ছিলেন। তিনি যে বাঙ্গালী নন—মারাঠী,—এটা ঘুণাক্ষরেও জানতামনা আমি। ষ্টার আর সর্দার আড্ডাটা জমিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের সজীবতায়। আমার 'নমামি' গ্রন্থে এঁদের কাহিনী গল্পাকারে লিখেছি।

প্রায় একমাস এখানে ছিলাম আমরা। পাশেই ছিল ডি. এর. পির কোয়ার্টার। সেখান থেকে প্রায়ই মুরগী আসত আমাদের বাসায়। সর্দার আর ষ্টার আর তাদের ফিরে যেতে দিতেন না। জামাইবাবু নায়কোচিত গাম্ভীর্যের সাথে প্রায়ই বলতেন—এসব ভাল না। বামুণটা বেশী জোরদার হয়নি।

দুই
চন্দননগর

৺বিনায়কর্‌ওরফে কাপলে ওরফে সত্যেনবাবুর সাথে আমি চলে গেলাম চন্দননগরে। সত্যেনবাবু অতি সুন্দর বাংলা বলতেন। চেহারা ছিল তাঁর খুবই সুন্দর,—রংও ফর্শা। আজ যখন তাঁর কথা লিখছি তখন মনে হয়—তাঁর চেহারায় যেন একটু অবাঙ্গালী ছাপ ছিল। আমাদের আস্‌তে হল কাটিহার—বারুনী—মোকামাঘাট হয়ে আমি রাজসাহীর লোক—আর অস্তবীণের পথ থেকে সরে পড়েছি। এই কারণে এর মধ্যেই আমার নামে সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে হুলিয়া বের করেছেন। তাই এই সতর্কতা। পথে দেখলাম অতি সুন্দর হিন্দী আর উর্দ্দু বলেন সত্যেনবাবু। মোকামা থেকে চন্দননগর পর্যন্ত গিয়েছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। এখানে সত্যেনবাবুর ইংরাজীর উপর অধিকারের পরিচয় পেলাম। পরে জেনেছি সত্যেন বাবু ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারতেন—মাতৃভাষা মারাঠী সহ ছয়টী ভারতীয় ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল।

খুব ভোরে সত্যেনবাবুর সাথে চন্দননগরের এক বাসায় উপস্থিত হয়েই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। যে ব্যক্তি দোর খুলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন তিনি আর কেউ নন্ স্বয়ং রাজেনবাবু—শ্রীনলিনী-কান্ত ঘোষ। আমার গ্রেপ্তারের পূর্বে জেনেছিলাম তিনি রিভলভারসহ গ্রেপ্তার হয়েছেন জব্বলপুরে—তারপর দালান্দা হাউসে তাঁর উপর চলেছে অমানুষিক নির্যাতন—যার গল্প শুনলেও মানুষ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। তিনি আমার সম্মুখে। কিন্তু কেমন করে এটা সম্ভব হল? মুক্তি পেয়েছেন?—অসম্ভব। পরে জেনেছি আমি যখন জেলে ছিলাম তারই মধ্যে রাজেনবাবু প্রবোধ বিশ্বাস ওরফে কালুদা'কে সাথে নিয়ে

দালান্দা-হাউসের প্রখর পুলিশ বেষ্টনী থেকে ভোজবাজীর মত উধাও হয়েছেন। কালুদাকেও সেই বাসাতেই পেলাম।

কিছুদিন পরে একদা প্রাতে দেখি দাদা এসে হাজির। দাদা— আমার দাদা! আনন্দে মন নেচে উঠল। শৈশবেই মা ও বাবাকে হারিয়ে একমাত্র দাদাকেই মায়া মমতার আধাররূপে পেয়েছি!—তাই আমার হৃদয়ের সব মায়াময় আকর্ষণ, সব শ্রদ্ধা কেন্দ্রীভূত হয়েছে দাদাতে। সবার উপর বড় সত্য এই যে দাদা আর আমি চলেছি অভিন্ন পথে—পথের নিষ্ঠ ও আমাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে শক্তিশালী করে তুলেছে! মায়া, মমতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নির্ভরতা সবটায় মিলে আমাদের সম্বন্ধকে করেছে মধুময়। দাদা তখন বিহারে থাকেন। মন্ত্রণার জন্য প্রায়ই আসতেন চন্দননগরে। আসামের প্রধান সংগঠক ৺নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে কর্ত্তাও আসতেন মাঝে মাঝে। সদা হাসিমুখ ছোট্ট খাট্ট মানুষটী। প্রায় বামনের সামিল। হৃদয় ছিল তাঁর দেহের ঠিক বিপরীত—উত্তুঙ্গ-মহান। সংযুক্ত প্রদেশ থেকে আসতেন ৺সুশীল লাহিড়ী। কাপলে, লাহিড়ী ও কর্ত্তা তিনজনই বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী—এঁদের মধ্যে অপরিসীম প্রীতির বাঁধন ছিল। একদিন তিনজন একত্র হয়েছিলেন—কী আনন্দ তাঁদের। রাজেনবাবু ঠাট্টা করে বলেছিলেন "বাসায় ত্রয়োস্পর্শ লাগছে"। সেইবারই কর্ত্তার আসাম ফিরে যাবার প্রাক্কালে তাঁর কোমরে বড় রিভলভার গুঁজে দিতে গিয়ে মহা ফ্যাসাদ্। বেঁটে মানুষ - কোমর এত উঁচু হল যে বাহির থেকে স্পষ্ট দেখা যায় একটা পোঁটলা। অবশেষে বাধ্য হয়ে ৪·৫০ সরিয়ে ৩·৮০ দেয়া হল। চন্দননগরের বাসাতেই আমি যুগান্তরের নামকরা নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, শ্রীনলিনী কর ও শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে দেখি। এঁদের গ্রেপ্তারের জন্য মোটা মোটা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন সরকার। রাজেনবাবুর সাথে একবার শ্রীমতিলাল

রায়ের প্রবর্ত্তক আশ্রমে গিয়েছিলাম আমি। সেখানে আরও বহু বিপ্লবীকে দেখেছি। কিন্তু তাঁদের নাম জানি না। আজ তাঁদের কথা লিখতে গিয়ে উদ্দেশে প্রণাম জানানো ছাড়া অন্য পথ নাই।

হঠাৎ একদিন খবর এলো চন্দননগরের ফেরারী আড্ডায় হানা দিবে বৃটিশ পুলিশ। শাদা ও কালো প্রচুর পুলিশ বাহিনীসহ রওনা হয়েছেন পুলিশের জাঁদরেল অধিকর্তা টেগার্ট সাহেব। সাজ সাজ রব পড়ে গেল বিপ্লবী আড্ডা গুলিতে। তখন তিন চারটী বাসাতে যুগান্তর আর অনুশীলন দলের ফেরারী নেতারা থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যুগান্তরের শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীনলিনীকান্ত কর, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ আর মন্মথনাথ বিশ্বাস। অনুশীলনের নেতাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ শ্রীকৃষ্ণলাল সাহা ওরফে জামাই, শ্রীবিনায়ক রাও কাপলে ওরফে সত্যেন, শ্রীপ্রবোধ বিশ্বাস ওরফে কালু—আর নেতাদের আজ্ঞাবাহী—এই আমি। আমাকে নিয়ে নলিনীবাবু বিব্রত বোধ করলেন। অবশেষে খুব সম্ভব শ্রীনলিনী করের সাথে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কোলকাতায়। কোলকাতায় আহিরীটোলা অঞ্চলে এক বাসায় আমাকে রাখা হ'ল। সেখানে যিনি থাকতেন তার 'গোঁফে দিলো চাড়া' শুনেই আমি ধরে নিলাম তিনি খুলনার অধিবাসী। দুদিন পর শ্রীভুপেন্দ্রকুমার দত্ত ওরফে বড়খোকার মুখে শুনতে পেলাম চন্দননগরে বৃটিশ পুলিশ বেড়াজাল ফেলেছিল—কিন্তু বিপ্লবীদের কাউকেও ধরতে পারে নি।

ভূপেনবাবুর চোখে মুখে তেজস্বিতা ফুটে বেরুত। কথাবার্তাও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। আমার বেশ ভাল লাগতো—তাঁকে। কিন্তু পাঁচ সাত দিন পর তাঁর একটি কথায় আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না।

ভূপেনবাবু খবরের কাগজ হাতে বাসায় ঢুকেছেন। আমাদের খুলনাই দাদা কাগজ নিয়ে পড়া সুরু করলেন! সব ভাল লোক কিনা। তাই প্রথমে চোখে এল ডাকাতির খবর। অবশ্য স্বদেশী বিশেষণে শুদ্ধিকৃত। সেই দিনই কাগজে দুটো ডাকাতির খবর বেরিয়েছে। তার একটী ঘটেছে জামনগরে—আমাদের গ্রামেব পাশের গ্রামে। আমি একটু কৌতুহল প্রকাশ করতে হঠাৎ ভূপেনবাবু বল্লেন দুটোই অনুশীলনের কাজ। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—তবে আমি কোথায়? যুগান্তরের আড্ডায়? যা' হোক চেপে গেলাম। কিন্তু দু দিন যেতে না যেতেই সেখানে কেষ্ট সাহা ওরফে জামাইবাবুর আবির্ভাব হল। এবারে ভূপেন বাবুরও ভুল ভাঙ্গল—তিনি আমাকে অনুশীলনের বলেই জানলেন।

কেষ্ট সা'র নির্দেশ অনুসারে ভূপেনবাবু আমাকে যেন বালি কি রিসড়া কোন্ ষ্টেশনে ট্রেণে তুলে দিলেন। বল্লেন—পথে চেনা লোক মিলবে। সত্যিই মিললো চেনা লোক। বোধ হয় বাঁশবেড়ে ষ্টেশনেই গাড়ীতে উঠলেন রাজেনবাবু, অর্থাৎ নলিনী ঘোষ আর দাদা। কোথায় যাচ্ছি আমার জানা ছিল না। কিছুদূর যাবার পর ভিড়ের মাঝে দাদা হাতে একখানি রেল টিকেট দিলেন। তাতে দেখি লিখা আছে মোকামাঘাট। যা'হোক দাদাদের অনুসরণ করে অবশেষে যেখানে নামলাম—সেটি হচ্ছে গৌহাটী। ষ্টেশনে যিনি আমাদের রিসিভ করলেন তাঁকে দেখে আমার খুশীর পার নাই। এযে—শশীদা রাজসাহীর শশী সান্যাল,—দাদার চেলা। প্রথমে উঠলাম আমরা উজান বাজারের একটা বাসায়। সেখানে পরিচয় হল মণি রায় ওরফে বন্ধুর সাথে। তাঁর কথাবার্তা আমি বড় একটা বুঝতে পারতাম না—ডাহা বাঙ্গাল। তবে মানুষ হিসাবে খুবই সরল আর উদার। প্রথম প্রথম কিছুদিন আমরা ফেরারীদের বাসায় রাতে শুতাম না। কর্তা ছিলেন আসামের

চার্জে। তিনি রাতে নলিনীবাবুকে এক বাসায় আর আমাকে রেল ষ্টেশনে দ্বিজেনবাবু নামীয় এক মালগুদামের কেরাণীর কোয়ার্টারে নিয়ে যেতেন। একদিন রাতে একাই দ্বিজেনবাবুর বাসায় যাচ্ছি; হঠাৎ চ্যালেঞ্জ 'কোন মান্নু?" আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা। পর মুহূর্তেই খেয়াল হ'ল ট্রেজারীর সমুখ দিয়ে চলেছি। সুতরাং জবাব দিতেই হবে। কি বলি? ফ্রেণ্ড?—হুজুর আমি? যদি না বুঝে। সুতরাং আসামী ভাষার অভিজ্ঞতা জাহির করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম "ভাল্ মান্নু"।—অর্থাৎ ভাল লোক। সিপাইরা আমার আসামী ভাষার জ্ঞানের বহর দেখে হেসেছিল কিনা জানিনা,—কিন্তু আমি রেহাই পেলাম। পরদিন বাসায় এ নিয়ে খুব হাসাহাসি। আমার মত ভাল মানুষকে সকলে "ভাল্-মান্নু—ভাল্ মান্নু" করে ক্ষেপাতে লাগল। নলিনীবাবু বললেন—"আর কত আসামী কথা শিখছ—কওছে শুনি।" আমি সগর্বে বললাম "রয়েছি আসামে, আসামী ভাষা শিখব না? তবে আমাকে পরীক্ষা করবে কে? কর্তা—আসামের কর্তা। তিনি কিছুটা সে দাবী করতে পারেন। এর পরই সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়ে আবৃত্তি জুড়ে দিলাম—

সীতা—বুহলিয়া! আরু ন ডাহোবা—
হ্যারা ছখি! কহছন বারু—
ক্যানেকা বাচিম্ মৈ রামর বিহনে?—

রাজেনবাবুর দিকে চেয়ে বললাম—এ ডাঙ্গুরিয়া! হাততালি না দিছা? মুখত, শুধুই ওলাইছে হাহি!

সেদিনের আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের মত আমার আসাম-বেঙ্গল ভাষা হুড়্হুড়্ করে চলছে দেখে সকলে হাসিমুখে হতবাক্।

কিন্তু কোন কাজ তো নাই। দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠলাম আমি। শুধু পলায়ন আর আত্মগোপন! এর জন্যই কি ভবিষ্যতের সমস্ত

সম্ভাবনা ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি এমন এক পথে যেখানে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সাথে মোকাবিলা হবার সম্ভাবনা আছে?

আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে গেল কর্তার কাছে। তাঁর নির্দেশমত আমি রাজনীতি আর অর্থনীতি সম্পর্কিত বই পড়া সুরু করলাম। আর সুরু করলাম গৌহাটীর চারিধারের পাহাড়ে পাহাড়ে আনাগোনা। মাঝে মাঝে রিভলভার ছুড়াও অভ্যাস করতাম নিভৃত অঞ্চলে।

এরই মাঝে একদিন বাসায় এল নলিনী বাগচী ওরফে খোকা। শুনলাম খুব মেধাবী ছাত্র। আলাপের বিশেষ সুযোগ হল না। দেখা দেখি মাত্র।

১৯১৭ সালের জুলাই কি আগষ্ট মাসে কর্তার সাথে হাজির হলাম উত্তর আসামের নাহোরকাটিয়ায়—ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযামিনী দত্তের কোয়ার্টারে। সেখানে প্রবোধ বিশ্বাস ওরফে কালুদার সাথে দেখা হল। যামিনীবাবু ছাড়া আরও দুইজন রেল কর্মচারী পার্টির সাথে সংস্থষ্ট ছিলেন। একজনের নাম শ্রীদেবেন দাস। অপর জনের নাম মনে নাই। এখানে থাকা কালেই গৌহাটীর খণ্ডযুদ্ধে রাজেনবাবু, তারাপ্রসন্ন দে ওরফে টিপু সুলতান, কর্তা, মণি রায় আর দাদা ধরা পড়েন। যামিনীবাবুর নামে পেন্সিলে লেখা একখানি পত্র আসে। তাতে লিখা ছিল—"Danger—Great danger, Keep them very safe.' ট্রেণের যাত্রীদের কাছেও যামিনীবাবু গৌহাটী সমরের খবর পেলেন। আমরা আলোচনায় বসলাম। কালুদা বললেন—ধরা আমি দেব না। রিভলভার আছে, —গুলী আছে। শেষ পর্যন্ত লড়ে আত্মহত্যা করব। তাই স্থির হল। কালুদা আর আমি নাহোরকাটিয়া চা-বাগানের ডাক্তারখানা থেকে এক শিশি হাইড্রোসেনিক এসিড যোগাড় করলাম। তাই নিলাম তিন জন ভাগাভাগি করে। রাত্রে শোবার ব্যবস্থা করলাম ডেহিং নদীর ধারে রেল সাইডিংএর মালগাড়ীতে। শীতে ঠক্ ঠক্ কাঁপায় সারা

রাত। বোধ হয় তৃতীয় দিন প্রাতে বাসায় ফিরে দেখি গৌহাটীর সমরক্ষেত্র থেকে পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে এসে হাজির হয়েছেন প্রবোধ দাশগুপ্ত আর নলিনী বাগচী। কাল বিলম্ব না করে নাহোর-কাটিয়া ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। যামিনীবাবুর প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁকে ফেরারী হ'তে বা আত্মহত্যা করতে নিষেধ করা হল। কারণ তিনি সংসারী,—স্ত্রী-পুত্র আছে। ধরা পড়লেও একদিন ছাড়া পাবেনই। আমরা রওনা দিলাম সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনসুকিয়া অভিমুখে।

জঙ্গলের পর জঙ্গল! হিংস্র প্রাণীর ভয় পদে পদে। কিন্তু বৃটিশ পুলিশ তার চেয়েও হিংস্র। প্রাণ হরণের চেয়েও ভয়াবহ কল্পনা তাদের আছে। চিন্তাতে ও আসে আতংক-শিহরণ। একদিকে এই আতংক অপরদিকে শেষ মানুষটী পর্যন্ত বিপ্লবী সংগ্রামের কল্পনা যুগিয়েছিল আমাদের পথের প্রেরণা।

উপস্থিত হলাম তিনসুকিয়ায়—সেখান থেকে ট্রেণে রিহাবাড়ী অর্থাৎ ডিব্রুগড়। উদ্দেশ্য ষ্টীমার পথে পাড়ি দিব গোয়ালন্দে। কিন্তু ষ্টীমার ষ্টেশনে গিয়ে সব প্ল্যান ভেস্তে গেল। দুদিন ষ্টীমার আসে নি—কবে যে আসবে তারও স্থিরতা নাই। সুতরাং স্থির হল লাডো মার্গেরিটা দিয়ে ঢুকে পড়ব উত্তর ব্রহ্মে। তিনসুকিয়ায় ফিরে এলাম, সেখান থেকে পদব্রজে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হাজির হলাম ডুমডুমায়। দুই দলে বিভক্ত হয়েছি চারজন। প্রবোধ দাশগুপ্ত ও প্রবোধ বিশ্বাস একদলে,—অপর দলে নলিনী বাগচী আর আমি। সেদিনের সেই বিচিত্র পথচলার স্মৃতি আজও আমার অন্তরে গেঁথে আছে। দুদিন তিনদিন খাওয়া নাই, স্নান নাই। রাতে গাছের ডালে,—দিনে পাহাড়ী পথের বাঁকে বাঁকে। একদিন চলতে চলতে দেখি জঙ্গলের ধারে একখানি দোকান—পশ্চিমার। অর্ডার দিয়ে রুটী আর তরকারী বানিয়ে নিয়ে তৃপ্তির সাথে খাওয়া গেল।

ডুমডুমা থেকে ডিগবয়,—কিন্তু এখান থেকেই আমাদের গুডবয়ের পশ্চাদপসরণ করতে হল। কারণ—

প্রহরী জাগ্রত দ্বারে ;
পরিচয় চায় বারে বারে,—
কেমনে গো হায়! পাশ কাটি তায়
যাইব সীমান্ত পারে!

সুতরাং ফিরিলাম।

আবার পথ চলা,—হেঁটে হেঁটে আবার তিনসুকিয়া। ঠিক করা গেল—দুত্তোর! আর পারা যায় না! হয়ে যাক্ এস্পার কি ওস্পার। এবার ট্রেণ পথেই লামডিং দিয়ে হিল সেক্সন ধরে হাজির হব চাঁদপুরে। তিনসুকিয়া বাজার থেকে পায়জামা আর ফেজ টুপী কিনে নিয়ে মুসলমান বেশে প্রবোধদারা দুজন চাপলেন ট্রেণের এক কামরায়, আর এক কামরায় নলিনী বাগচী আর আমি সাদাসিদে ছাত্রের বেশে। লামডিংএ গাড়ী বদল করে চাপলাম—হিল সেক্সনের গাড়ীতে। তারপর পর পাহাড় আর বনের অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে অবশেষে পৌঁছে গেলাম বদরপুরে। লাক্সামে আবার গাড়ী বদল,—এ, বি, আর থেকে ই, বি, আর এর গাড়ীতে চাপা। তারপর অশান্ত ভিড়ের মাঝে নির্বিঘ্নে হাজির হলাম চাঁদপুরে। উঠলাম ষ্টীমারে।—বাগচী বললেন "বড় ক্ষিদে পেয়েছে। এবারে ভাত খাই!" ডাইনিং রুমে বসে ভাতের অর্ডার দেয়া গেল। এল ভাত আর মুরগীর ঝোল। আমার তো আধ প্লেটেই পেট গেল ভরে। কিন্তু বাগচীর জঠরাগ্নি যেন ঘৃতাহুতি পেয়ে দাউ দাউ জ্বলে উঠেছে। নিজের প্লেট, আমার প্লেটের বাকীটা, তারপর আর একবার দুই প্লেট ভাত নিয়ে অবলীলাক্রমে সাবাড় করে দিলেন।

গোয়ালন্দ। তারপর একদম নৈহাটী। এখানে নামলাম আমরা।

টিকেট উইণ্ডোর উপরে দেখি বড় বড় বিজ্ঞাপন—ফেরারীদের গ্রেপ্তারের জন্যে সরকারের পুরস্কার ঘোষণা। আমার নামও ছিল তার মধ্যে। বেশ উৎসুক হয়ে দেখছি,—বাগচী নিষেধ করলেন। ওদিকে বেশী কৌতুহল দেখালে পুলিশের সন্দেহ হতে পারে।

ব্যাণ্ডেল মোকামা, বারুনী জংশন হয়ে হাজির হলাম মুজঃফরপুরে—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায়। ব্রজেন বিহারের উৎসাহী কর্মী। পরের দিন সে আমাদের নিয়ে গেল ফেরারী আড্ডায়। সেখানে গিয়ে জানলাম এক হেঁপো রুগী বিহারের চার্জে। তাঁর নাম ক্ষেত্র সিং। ক্ষেত্র সিং? এযে খুবই চেনা নাম। ইনিই না রাজসাহী জেলার ধরাইল ডাকাতিতে ধরা পড়ে—শেষে ১০৯ ধারায় এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন? মেয়াদ শেষে অন্তরীণ—সাথে সাথেই অন্তর্ধান! ঠিক তাই। এঁর বিরুদ্ধেও পুরস্কার ঘোষণা আছে। বাসায় ছিল তের বছরের দুটি ছেলে। শুনে অবাক হলাম এরাও ফেরারী! বড়কা আর ছোটকা—ডাক নাম মুন্টু আর বুলু। আসল নাম তখনও জানতাম না,—জানার উপায়ও নাই। পরে জেনেছি দুজনই ভাগলপুরের ছেলে। যোগসার মহল্লায় বাড়ি—আসল নাম পূর্ণচন্দ্র রায় আর বিভাংশু বসু।

এবারে বিহারের কথা কিছুটা বলি। বসন্ত চাটুয্যের হত্যার পর—সরকারী দর্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল বাংলার বিপ্লবী দলগুলি। আসাম ছিল Shelter,—অর্থাৎ ফেরারীদের আশ্রয়। গৌহাটীর দুর্ঘটনার পর আসামের আশ্রয় ভেঙে যায়। বিহারের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রত্যেক জিলায় অনুশীলনের শাখা সমিতি বেশ জোরদার ছিল এবং প্রত্যেক জেলার চার্জে ছিল অনুশীলনদলের ফেরারীরা। বহু ছাত্র দলের সভ্য ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে বিহারে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দলের

প্রসার ছিল। সক্রিয় না হলেও সহানুভূতিসম্পন্ন বহু সদস্য ছিল বিহারে।

এবারে তাঁদের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া যাক্। মুজঃফরপুর ছাত্র মহলের উৎসাহী সক্রিয় কর্মী ছিলেন শ্রীরামবিনোদ সিং শ্রীধ্বজাপ্রসাদ সাহু, শ্রীকামতাপ্রসাদ সাহু, শ্রীব্রজেন্দ্রলাল ব্যানার্জি, শ্রীকৃষ্ণ চাটার্জী ওরফে দাসু শ্রীবনোয়ারী প্রসাদ, শ্রীমদন প্রসাদ আরও অনেকে যাঁদের নাম দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে মনে পড়ে না। প্রফেসর মহলে শ্রী জে, বি কৃপালিনী (আচার্য কৃপালিনী) প্রফেসর মালকানি, প্রফেসর চ্যাবলানি আমাদের দলের সহানুভূতিশীল সদস্য ছিলেন। সরকারী চাকুরেদের মধ্যে শ্রীকালিকাপ্রসাদ বার্মা আরও ২।৩ জন। সব চেয়ে মজার কথা পুলিশের এ, এস, আই বাওজী শ্রীরামদত্ত সিং ছিলেন দলের সক্রিয় সদস্য। বহু রাতে আমি তাঁর সাথে বেঁাদে বেরিয়েছি। যেমন বলিষ্ঠ দেহ, তেমনি বলিষ্ঠ মন। জমিদারদের মধ্যে মুজঃফরপুরের জমিদার বাবু বৈজনাথ প্রসাদ আমাদের মস্ত বড় সমর্থক। তিনি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন—খুব প্রতিপত্তিশালী। তাঁর বাড়ীতে আমাদের আড্ডা ছিল। এ ছাড়া জমিদার শ্রীকনৈয়ালাল সাহুর বাড়ীতেও আমাদের গতিবিধি ছিল। উকীল কালী বসু—যিনি শহীদ ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন—আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন!

পাটনার অর্গানিজেশন বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রমণীবাবু নামে এক উকীল আমাদের সভ্য ছিলেন পাটনায়।

ভাগলপুর আর মুঙ্গেরে দলের শাখা দুটি বেশ জোরদার ছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আসব। এখন কাহিনীতে ফিরে যাই।

মুজঃফরপুরের ফেরারী আড্ডায় দু'তিন দিন ধরে আমাদের আলোচনা চলল। গৌহাটী কেন্দ্রের বিপর্যয়ে বাংলার সাথে বিহারের

যোগাযোগ নষ্ট হয়েছে। স্থির হল নলিনী বাগচী কোলকাতায় গিয়ে— সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে।

নলিনী চলে গেল কোলকাতায়। সংযোগের কোন সূত্র বের করতে না পেরে হতাশ হ'ল সে। এদিকে আক্রান্ত হ'ল বসন্ত রোগে। অবস্থা সঙ্গীন বুঝে সে গড়ের মাঠে মনুমেন্টের পাশে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। দলের লোকেরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে আশে পাশেই ঘোরা ফেরা করে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে। অপেক্ষা করতে করতে জ্বরের বেগে চৈতন্য হারালো নলিনী। দলের অন্যতম নায়ক শ্রীসতীশ পাকড়াশী তাকে সেই অবস্থায় পেয়ে নিয়ে এল বিপ্লবীদের বাসায়। ডাক্তার বদ্যি নাই। টোটকা ওষুদ আর অন্তরের সেবায় সেরে উঠল নলিনী। এধারে হতাশ্বাসে আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। নলিনী যে সরকারী আশ্রয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু আচমকা প্রায় একমাস পরে কোলকাতার চিঠি পেলাম আমরা— আলোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে যেতে হবে কোলকাতায়। প্রবোধ দাশগুপ্ত আর আমি রওনা হলাম। বেলঘরিয়া ষ্টেশনে নলিনী বাগচীই আমাদের রিসিভ করতে এসেছিল। তার সাথে কোলকাতার অলি গলি ঘুরে বস্তির একখানি ঘরে আমরা উপস্থিত হলাম। ছোট্ট খোলার ঘর। একটা জানালা—দোর ঠিক দুটোই আছে। দেখুন! বিপ্লবীরা কেমন প্রাজ্ঞ। আর কেমন শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মেনে চলে। শাস্ত্রে আছে—উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ—তথা অপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ—
তাই সমুখের দোর হয়েছে উপায়—আর খিড়কী হচ্ছে অপায়—অর্থাৎ মুস্কিল আসানের চেরাগ্।

রাত তো কাটানো গেল। দিনের বেলা এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হলাম আমরা। সামনের দোরে চড়ল তালা! সুতরাং ঘরের মধ্যে আমরা তিনজন মৃত সৈনিকের অভিনয় করে পড়ে রইলাম।

রাতের বাসী ভাত তেল নুন দিয়ে মেখে নিঃশব্দে গিলে আহারের পর্ব সমাধা করা গেল। বিপদ দেখা দিল প্রস্রাবের বেলা। তিনটে দৈএর ভাঁড়—আধসেরী, পোয়া, আধপোয়া। এমন ভাবে কাজ সারতে হবে যেন ছড়্ ছড়্ শব্দ না হয়। প্রথমে ধরতে হবে বড় ভাঁড় তাতেও না কুলালে মাঝারিটা। তারপর তাবৎ মাল ছোট ভাঁড়ে ঢেলে ঢেলে খিড়কীর চৌকাটের নিচু দিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষীণ ধারে ফেলতে হবে বাহিরে। এই ব্যবস্থা। যাক্—রাত এল,—হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বিপ্লবীরা হিংসানীতির উপাসক কিনা,—তাই—হিংস্র জানোয়ারদের মত তাদের আচার ব্যবহার,—দিনে বোকা—রাতে রোখা।

খিদেয় পেট জ্বলছিল। নলিনী নিয়ে এল, মুড়ি, বেগুনী আর ঘুঘনী। মহানন্দে 'জল খাই' সেরে—ষ্টোভে ভাত বসানো গেল। কিছুক্ষণ পর এলেন তারিনী মজুমদার ওরফে ষ্টার। কিন্তু একি? লম্বা দাড়ির প্রসাদে এ যে গুরু গম্ভীর হব্য চব্য চেহারা! দিনাজপুর বাসার অদম্য চঞ্চলতায় ভরা সর্দারের সাথে সর্বদা যুদ্ধরত বলিষ্ঠ যুবক আজ দায়িত্বের চাপে সৌম্য, শান্ত, ভদ্ররূপে পরিবর্তিত হয়েছে।

আমরা চারজন দলের অবস্থা ও ভবিষ্যত কর্মনীতি সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা করলাম। নূতন কোন পথের সন্ধান পেলাম না। দলের বিস্তার, গোপন ইস্তাহার, প্রচার আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে জোর দিতে হবে, পুলিশের আক্রমণ পদে পদে প্রতিরোধ করতে হবে,—জ্যান্তে ধরা দেবে না নেতৃস্থানীয় ফেরারা বিপ্লবী একজনও। আরও স্থির করা গেল নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের দুই একজনকে জেল থেকে উদ্ধার করতে হবে। খবর পাওয়া গেল নলিনী ঘোষ আছেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আর রমেশ আচার্য্য আছেন ভাগলপুর জেলে। কেদারবাবু

কোন জেলে আছেন তখনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। তবু এই তিন জনকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে স্থির হল। আরো স্থির হল নলিনী থাকবে পূর্ববঙ্গের চার্জে—বিহারে আর ফিরবে না।

প্রবোধদা আর আমি ফিরে গেলাম মুজঃফরপুরে। ফেরার পথে বারুণী জংশনে একজন পুলিশ জমাদার আমাকে জিজ্ঞেস করল—কাঁহে এৎনা উদাস মালুম হোতা—

এই সেরেছে! অনাহার, অনিদ্রা, অস্নান,—তিনটেয় মিলে চেহারা করেছে একদম ম্রিয়মান। সুতরাং পুলিশ প্রভুর সন্দেহ,—এবং তস্মাৎ প্রশ্নম্। প্রবোধদা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বললেন—জমাদারজী! হামারা ভাতিজা হ্যয় ইয়ে। পরশু খবর মিলা হামারা ভাইকে ইন্তেকাল হুয়া। তবসে ইয়ে লড়কা দানা পানী সব ছোড়া"। আমি চাদরে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলাম। জমাদারজী নানারকম প্রবোধ দিয়ে নেমে গেলেন। ট্রেণ ছাড়লো—আমাদেরও ফাঁড়া কাটলো।

নির্বিঘ্নে ডেরায় ফিরলাম। মুজঃফরপুরের কাজকর্ম ধীরে ধীরে বুঝে নিতে লাগলাম আমি। কিন্তু কোলকাতার আর কোন খবর নাই! খবরের কাগজে পড়লাম দলের অন্যতম নেতা শ্রীসতীশ পাকড়াশী কোলকাতার হাইকোর্টের কাছে গ্রেপ্তার হয়েছেন। খুব খানিকটা হেসে নিলাম আমরা। একেই বলে "বাঙ্গালের হাইকোর্ট দেখা!"

আমাদের কোলকাতার পরামর্শ মত উদ্ধারের চেষ্টা চলতে লাগলো। কোলকাতার বন্ধুরা আলীপুর জেলে শ্রীনলিনী ঘোষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ছিলেন। নলিনীবাবুর জেল থেকে পালানোর ব্যবস্থাও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বোধ হয় টের পান। তাই অকস্মাৎ নলিনীবাবুকে জব্বলপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

রমেশদাকে উদ্ধারের ভার ছিল আমাদের উপরে। আমরা ভাগলপুর

জেলে খোঁজ নিয়ে দেখি কয়েকদিন আগেই তাঁকে কোলকাতার জেলে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং উদ্ধার পর্ব এখানেই শেষ।

কিন্তু আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজের উদ্ধারের ব্যবস্থা নিজেই করে মজঃফরপুরে এসে গেলেন এক বন্ধু। তিনি আর কেউ নন—শ্রীদীনেশ বিশ্বাস,—আমাদের ফুঙ্গী দা—রাজসাহীর ঘোষের সরবতের দোকানের মালিক। রহরমপুরে ধরা পড়েন! ১০৯ ধারায় এক বছরের জন্য শ্রীঘর বাসের পর—তাঁকে বীরভূম জেলায় অন্তরীণের আদেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু habitual criminal কখনও কারাবাসে শোধরায়? তাই তিনি সাফ্ কেটে পড়ে বুদ্ধিমানের মত মুজঃফরপুরে হাজির হলেন। আমরা মহাখুশী।

আবার জল্পনা-কল্পনা। আলোচনায় ঠিক হল 'যুগান্তরের' নেতারা ধরা পড়েন নি। তাঁদের মধ্যে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি আর শ্রীসতীশ চক্রবর্তীর ক্ষুরধার বুদ্ধি আর সংগঠন শক্তির বিশেষ খ্যাতি আছে। সাহসী ও কর্মকুশল বলে শ্রীঅতুল ঘোষও বিশেষ পরিচিত। চন্দননগরে খুঁজে পেতে এঁদের তিনজনকে—অন্ততঃ একজনকেও বের করতে হবে। দীনেশদা রামবিনোদ বাবু আর ব্রজেনের সাহায্যে বিহারের কাজকর্ম দেখুন। আমরা সব চলে যাই বাঙ্গলায়—কোলকাতার কেন্দ্র গোছানোও হবে,—যাদুদারদের খোজ করাও হবে।

সদলবলে হাজির হলাম শ্রীধাম নবদ্বীপে। স্থান নির্বাচনের কারণ হচ্ছে—তীর্থক্ষেত্র। প্রতিদিন বহু ধরনের বহুলোক আনাগোণা করে। সুতরাং আমাদের আনাগোণা কারোও নজরে আসবেনা। আর প্রয়োজন হলে পাঁচ সাত দিন জয় নিতাই বলে আখড়ায় কাটিয়ে দেয়া যাবে। হ'লও তাই। আমরা ছ'জন—প্রবোধ বিশ্বাস, প্রবোধ দাশগুপ্ত, ক্ষেত্র সিং, মুণ্টু, বুলু, আর আমি—দু'দিন আখড়ায় বাস করে একটা বাসা ভাড়া করলাম।

প্রবোধ দা (দাশগুপ্ত) আর আমি একদিন বেরিয়েছি বাজারে। হঠাৎ একটী লোক এসে প্রণাম করে আমার পায়ের ধূলো নিল। চেয়ে দেখি আমাদের গাঁয়ের কোকন দাশ। তবুও বিস্ময়ের ভাণ করে বললাম—'কে ? আমি তো চিনতে পারছি না।' তার বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ফী বছর পুজোতে সে আমাদের বাড়ীতে প্রতিমা গড়াতো—দিনের পর দিন। আমাকে চিনতে না পারার কোন কারণই নাই। এর পর প্রবোধ দা দিলেন ধমক—'কাকে কি বল' ? বেচারা অপ্রস্তুত হয়ে আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষের নাম ধাম বলতে লাগল। পুনরায় ধমকানো আর আমাদের পাশ-কাটানো।

এরই চার পাঁচদিন পরে। বিকেল বেলা। মুন্টু, বুলু গিয়েছে গঙ্গার ধারে বেড়াতে। যাদুদাদের খোজের উদ্দেশ্যে প্রবোধ-যুগল চন্দননগর রওনা হয়েছেন। বাসা থেকে বেরিয়ে ক্ষেত্রদা আর আমি তাঁদের এগিয়ে দিচ্ছি বড় সড়ক পর্যন্ত। ক্ষেত্র দা'র আর আমার খালি গা—কোঁচার আঁচল গায়ে। প্রবোধদারা প্রায় ১০।১২ গজ আগে। হঠাৎ একদল লোক এসে তাঁদের নাম ধাম জিজ্ঞেস করল। তাঁরা কি যেন বললেন। আগন্তুকদের একজন চেঁচিয়ে উঠল—No—certainly not. তার পরই চেপে ধরা। ক্ষেত্রদা আর আমি about turn and quick march. বাসায় ঢুকে সদর বন্ধ করে দিলাম। চটপট জামা পরে—টাকা, রিভলভার আর বিষ নিয়ে পর পর তিনটে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পেছনের পথে পড়লাম। একটা উচু প্রাচীরে ক্ষেত্রদাকে উঠাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল আমার।

নদীর ধারে এসে বহু খুঁজেও মুন্টু আর বুলুকে পেলাম না। ক্ষেত্রদা চীৎকার করে ডাকলেন। তার পরের কাহিনী 'নমামি'র পাঠকরা জানেন। ক্ষেত্র দাকে নিয়ে কেষ্টনগর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ হ'য়ে হাজির হলাম ভাগলপুরে। সেখানে দুদিন থেকে চলে গেলাম

মুজঃফরপুরে—ব্রজেনের বাড়ীতে। কিন্তু সেখানে এক অবাক্ কাণ্ড। ব্রজেনের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষেত্র দা জানালেন বিশ্বাস আর দাশগুপ্ত ধরা পড়েছেন।—

মুন্টু, বুলু?

"সম্ভবতঃ ওরাও ধরা পড়েছে"—দুঃখের সাথে জানালেন ক্ষেত্রদা। ঠিক সেই মুহূর্তেই মুন্টু আর বুলু এসে আমাদের পায়ের ধূলি নিল। হাসির হৈ চৈ তে আমরা মশগুল।

আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এই। সন্ধ্যার পর মুন্টু-বুলু বেড়িয়ে এসে দেখে বাসার সদর দোর বন্ধ। অনেক ডাকাডাকিতেও কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ওরা বাসায় ঢোকে। এসে দেখে সবই ঠিক আছে শুধু আমাদের কারো পাত্তা নেই। সারা রাত ওরা ওখানেই থাকে। পরদিন প্রাতে পথে ঝি'র সাথে ওদের দেখা হয়। ঝির কাছে জানতে পায়—দাদারা সব ধরা পড়েছেন। পুলিশ বাসার খোজ করছে। ঝি বলে "তোমরা আর এক মুহূর্তও ওখানে থেক না—যদি বাচতে চাও, পালাও"। ওরা তারপর কোলকাতা হয়ে সিধে পাড়ি দেয় মুজঃফরপুরে। ব্রজেনকে জানায় আমাদের গ্রেপ্তারের কথা।

পরদিম আমরা ফেরারী বাসায় পার হলাম। বোধ হয় দু'তিন সপ্তাহ পরই আমাদের বাসা ঘেরাও করে পুলিশ। অন্য একটা বাসা ঠিক করে সেখানে বন্দুক রিভলভার জিনিষপত্র পার করা হয়েছে। রাতেই সেখানে যাবার কথা। কিন্তু ক্ষেত্রদার শরীরটা খুব খারাপ বোধ হওয়ায় সে রাতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সকালেই পুলিশের বেড়াজাল। দীনেশদা, ক্ষেত্রদা, মুন্টু, বুলু—সব ধরা পড়ে গেল—ধরা পড়লাম না আমি। আর স্থানীয় বিহারী যুবক মদন। মুন্টু আর বুলু তো ঠিক আমার সামনেই ধরা পড়ে। আমি চট্ করে এক গলিতে ঢুকে ভদ্রলোকের মত হেঁটে চললাম।

ফেরারী জীবনে বহুবার দেখেছি একটু অসতর্ক হয়েছো আর কথা নাই। সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে সংগ্রামের জন্য। আর চার দিকে চোখ রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম হয়েছে—কি গিয়েছো।

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কাহিনী লিখতে গিয়ে হাসি পায় আধুনিক নামকরা নেতাদের ফেরারী জীবনের রোমান্টিক কাহিনী শুনে। আমাদের কাছে ওগুলো ছেলেখেলা মনে হয়। আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ীতে বেশ আদর যত্নেই রয়েছেন—পুলিশের তাড়া নাই,—মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা নাই—যেখানে যা'ন বেশ খাতির সম্মানও পা'ন,—অথচ ফেরারী! বহুত আচ্ছা!

তিন

'সকলে গেল ম'রে
কর্তা হ'ল হ'রে'

এখন হ'রে বিহারের কর্তা। লেগে গেল সে ঘর গুছাতে। ক্রমেই তার মনে একটা কথা দানা বাঁধছে—মাটীর সাথে আমাদের সংযোগ নাই। সমাজ থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। দেশের জন-সাধারণ আমাদের বাহবা দেয় কিন্তু ভয় করে। গণচেতনা সমর্থনের স্তরে আসে নি। সুতরাং ব্যাপকভাবে প্রচার প্রয়োজন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মীর দরকার। রামবিনোদ বাবুর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম বিহারের হেডকোয়ার্টার সরিয়ে নিতে হবে ভাগলপুরে। রামবিনোদ বাবু হবেন আমার প্রধান সহকারী। শ্রীবসন্ত বক্সী—চাঁদপুরের ফেরারী—ভাগলপুর জিলার চার্জে থাকবেন। কামতা প্রসাদকে পাঠানো হবে মুংগেরে। ব্রজেন ভার নেবে পাটনার। আর মুজঃফরপুরের চার্জে থাকবে—বড়খোকা—(নাম মনে নাই—বাংগালী) আর বনোয়ারী।

ব্যবস্থামত যে যার স্থলে চলে গেল। আইনের ছাত্র শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ শাহু—ভাগলপুরের বড় জমিদার শ্রীরঘুনন্দন লালের গৃহের এক অংশে ছোট ভাই রাজকিশোরকে নিয়ে থাকতে লাগলেন। বসন্তবাবু—(গুরুজী) আর আমি সেই আশ্রয়ে। জমিদার গৃহে প্রতিদিন চলে বাইজীদের নৃত্যগীত। তারই আড়ালে চলে আমাদের গোপন অভিযান।

ভাগলপুরের দলটা বেশ গড়ে উঠেছিল। ৺মদনগোপাল যোশী—যিনি পরে কলিকাতা বড়বাজার কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী হয়েছিলেন—আমাদের খুবই উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তা ছাড়া কিশোরাবাবু (সিং), সচ্চিদানন্দ, জয়ন্ত সরকার প্রভৃতি বাঙ্গালী ছেলেরা বিশেষ যোগ্যতা দেখিয়েছে সংগঠন ব্যাপারে। এদের মাধ্যমে আমরা বহুলোককে সহানুভূতিশীল সভ্যরূপে পাই। বহু ছেলেও আসে দলে। তাদের নাম আজ ভুলে গেছি। কিন্তু তাদের আকৃতির ছবি আজও মনে গেঁথে আছে। এই সময় রামবিনোদ বাবু মোটিয়া খদ্দর এনে দেন আমাকে। গান্ধীজির চম্পারণ সত্যাগ্রহ বিহারে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে তখন। মোটিয়া তারই প্রথম নমুনা।

ভাগলপুর সহরের দুই মাইল দূরে নাথনগর গ্রাম। সেখানে একটা মিলিটারী ছাউনীও ছিল তখন। নাথনগরে আমাদের সংগঠন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। রেল লাইনের ওপারে ছিল বাবু রাসবিহারী লালদের বাড়ী। রাসবিহারী বাবু অতিশয় বুদ্ধিমান এবং উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তাঁর বড় ভাই কৈলাস বিহারী বাবু ছিলেন সহানুভূতিশীল সদস্য। জমিদার বাড়ীর আস্তানায় পুলিশের নজর পড়ার পর আমি কিছুদিন রাসবিহারী বাবুদের বাড়ীতে কাটিয়েছি। রাসবিহারী বাবু আজ বিহার বিধান সভার সদস্য। কৈলাসবাবু এম্ পি।

এ ছাড়া নাথনগরে কৃষকদের মধ্যেও আমাদের দলের সভ্য ছিল।

নাথনগর পাঠশালার পণ্ডিত—শ্রীমাহেশ্বরী লালের চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়। আজও পণ্ডিতজীর চেহারা আমার মনে পড়ে। পুলিশরা যেদিন আমাদের বাসায় ভুলক্রমে ঢুকে পড়েছিল সেদিন তাঁর রুদ্র-মূর্তিও দেখেছি।

সমিতির কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। টাকার অভাবটা প্রবল হয়ে উঠল তখন। ছেলেরা বাড়ী থেকে যে যা পাবে এনে দিতে লাগল। রামবিনোদ বাবুও কিছু টাকা সংগ্রহ করে দিলেন। আমি খবর পেলাম তাঁর পিছনে টিকটিকি লেগেছে। তাঁকে সতর্ক করে দিলাম। এখবরও পাওয়া গেল পুলিশ বিহারে শচিলালকে খুব খুঁজছে। একদিন তো মুংগের যাবার পথে আমাকেই জিজ্ঞেস করে বসল। একথা ওকথা বলে কোন রকমে পাশ কাটাই,—পরে প্রাণ খুলে হাসি।

বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে নেমে যেতে হয় খড়্গপুরে। সেখানে কিছু বাঙ্গালীর বাস আছে। সেখানেও একটি শাখা-সমিতি ছিল,—পাঁচ ছয় জন সভ্য। আমি সেখানেও গিয়েছি কাজকর্মের নির্দেশ দিতে আর টাকার যোগাড় করতে।

তারপর গেলাম বেতিয়ায়। বেতিয়া হাইস্কুলের হেডমাষ্টার হরবংশ বাবু খুব কাজের লোক ছিলেন। তিনিও কিছু টাকা যোগাড় করে দিলেন। তাঁর বাড়ীতে "থালিয়াভর ক্ষীর মালাই" খেয়ে নিলাম। একে পেটুক,—নাটোরে বামুন,—তার উপর বহুদিন ভাল খাবার তো কপালে জোটে নি। খাবার পর ভয়—কলেরা না হয়! মাষ্টার মশাই সাহস দিয়ে বললেন—'কুচ্ নাই হোগা।" জলের গুণে সত্যিই হলনা কিছুই।

গেলাম টাকার যোগাড়ে মুজঃফরপুরে। ক্ষেত্রদাদের কেস তখন চলছিল—সেই ১০৯ ধারার মামলা। কালীবাবুকে দিয়ে ডিফেন্সের

ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা। কালীবাবু এক পয়সা ফী নেন্‌নি। উপরন্তু কিছু সাহায্যই করেছেন। রাওজি-রামদত্ত সিং বললেন বড়দা অর্থাৎ ক্ষেত্রদা জেল থেকে পলাতে চান এবং তার ব্যবস্থাও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। খুঁটানাটি খতিয়ে শুনলাম। আমি নিষেধ করলাম। কারণ মনে হল মুজঃফরপুরের যে কয়টি নির্ভীক ও উৎসাহী সভ্য আছে সব সাবাড় হবে এই প্রচেষ্টায়। তার উপর একটী রুগীকে বাইরে এনে সমিতির বিশেষ লাভও হবে না। বরং ব্যতিব্যস্ত হতে হবে তার জন্য।

মুজঃফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ চ্যাটার্জী ওরফে দাসু তার পিতার সিন্দুক খুলে বোধ হয় তিন হাজার টাকা এনে দেয় আমার হাতে। এই টাকা দিয়ে আমি মুংগের থেকে তিন চারটে রিভলভার আর কার্ত্তুজ কিনি। মুজঃফরপুরে কালেক্টরীর Gun licence clerk কালিকাবাবুর সাহায্যে একটা দোনালা বন্দুক কিনি। সমিতির বিস্তার বাবদও কিছু কিছু খরচ করি।

এর মধ্যে একটা রিভলভার ছিল—মুংগেরের খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের। খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল এতে। কামতা প্রসাদ ধরা পড়ে গেল। বসন্তবাবু আর আমি ছুটে গেলাম মুংগেরে। বাবু রাজকুমার সিং.—আর একজন Gun maker—আমাকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে বললেন। দেখা করলাম আমাদের উৎসাহী সভ্য দেবেন দাশগুপ্তের সাথে। বেশ লোকটী। ভাল অভিনেতা। দেবেনও আমাকে চলে যেতে বললো। এধারে যে নিরালা বাড়ীটি ভাড়া করা ছিল মনে হল সেই বাড়ীটির উপরও যেন পুলিশের চোখ পড়েছে।

আর দেরী করা সঙ্গত নয় মনে করে বসন্তবাবু আর আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটী মাঠের মধ্যে পড়েছি। দেখি দু'তিনজন লোক আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। বেশী কাছে আসতে দেয়া ঠিক নয়

বিবেচনায় আমি রিভলভার বের করে একটী গুলী খরচ করলাম। লোকগুলো উল্‌টো মুখে দৌড় আর চীৎকার সুরু করল। এবার আমরাও আঁধার পথে দৌড ধরলাম। কন্‌কনে শীত। তারই মধ্যে দরদর করে ঘাম ঝরছে। হেঁটে হেঁটে এসে হাজির হলাম জামালপুরে। সেখানকার পাহাড়ে একটী মন্দির আছে। সেখানে উঠে রাত দুটো পর্যন্ত বিশ্রাম করার পর আবার নামলাম পথে। হেঁটে হাজির হলাম ভাগলপুরে,—নাথনগরে পণ্ডিতজীর আশ্রয়ে।

পুলিশ আমাকে খুজছিল খুবই। আমার গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কারের পরিমাণ পাঁচশো টাকা থেকে হাজারে উঠেছে। A.S.I. রামদত্ত সিং ওরফে রাওজীর কৃপায় সব খবরই পাচ্ছি। মাস তিন আগে ঢাকায় কলতাবাজারে ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে। সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে দলের অধিনায়ক তারিনী মজুমদার ওরফে ষ্টার আর নলিনী বাগচী ওরফে খোকা, ওরফে পাবলিশার, ওরফে স্কলার—মৃত্যুবরণ করেছেন। ষ্টারের বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্তি আর নলিনীর প্রতিভায় ভরা দৃষ্টি আজও আমার মনে গেঁথে আছে।

এবারে আমার পালা। দৃঢ়পণ—জীবন্তে ধরা দেব না। দেখিয়ে দেব বিপ্লবীদলের শেষ মানুষটীও হতাশায় মুসড়ে পড়ে না,—বীরের মত মরতে জানে। এই সময় ইতালীর বিপ্লব-গুরু মাৎসিনির আত্মজীবনী আর মোট্‌লের ডাচ্‌ রিপাবলিকের ইতিহাস পদে পদে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের অভীঃ মন্ত্রের ওজস্বিনী ধারা সেই দুর্দিনে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিহারে পণ্ডিত রামরাখার সাথে দেখা করলাম। উদ্দেশ্য,—ধর্মের মাধ্যমে জাতীয়তার প্রচার। স্বামী সত্যদেও এপথের অগ্রণী। পণ্ডিতজী কাজ সুরু করে দিলেন। তখন বোধ হয় ডিসেম্বর মাস। কোলকাতার চিঠি পেলাম। ইলিসিয়াম রোতে আই, বি অফিস আক্রমণ করার

সিদ্ধান্তে সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে কোলকাতার কেন্দ্র। নেচে উঠল আমার মন। এইবার—এইবার সার্থক করব মরণের আহ্বান'— মরার মতন,—না লভি মরণ,—

বীরের মতন মরিবি কে।—

আয়! আজি আয় মরিবি কে।"

এতদিনে সফল হবে আমার স্বপ্ন—আমার সাধনা। মেধাবী ছাত্র জিতেশ লাহিড়ী বড় জোর একটা প্রফেসর, একটা বড় উকীল বা একটা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারতো কিন্তু বিপ্লবী জিতেশ লাহিড়ী বুকের রক্তে লিখে যাবে তার নাম ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম-ইতিহাসের বিশেষ অধ্যায়ে। আর দেরী নয়।

বসন্তবাবুকে নির্দেশ দিলাম মুংগের আর মুজঃফরপুরে যে তিন চারটি রিভলভার আছে সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে রামবিনোদবাবু, মদন ব্রজেন আর দেবেনের সাথে যথাসম্ভব সত্বর কোলকাতা পৌঁছাতে। জয়ন্ত আর আমি দুজনে দুটো রিভলভার নিয়ে পাড়ি দিলাম কোলকাতায়।

বেলুড় ষ্টেসনে আমাদের নামিয়ে নিলেন শ্রীশশীশেখর সান্যাল ওরফে শেখরদা,—দাদার চেলা,—যাঁকে এর আগে পেয়েছি গৌহাটীর বাসায়। নাচা-মন এবারে তুড়ি লাফ দিল, অথবা ঢাকাই ভাষায় আনন্দে 'ফাল্' দিল গিয়া। কিন্তু এই ফাল্ যে আমার কাল হবে সে কথা তখনও বুঝিনি।

বোধ হয় তালতলা অঞ্চলে একটী বাসায় উঠলাম। সন্ধ্যায় শশীদা'র সাথে ছ'ফুট লম্বা এক ভদ্রলোক এলেন। শশীদা জানালেন ইনিই এখন কেন্দ্রের চার্জে। পরামর্শ হল। প্রস্তাবিত action এর চার্জ নিতে হবে আমাকে। বিহার থেকে অন্ততঃ সাত আটটি 'যন্ত্র' (রিভল-ভার) সংগ্রহ করা প্রয়োজন। লম্বু বললেন আপনারা যে দুটী রিভল-

ভার আর ষাট্ রাউণ্ড কার্ত্তুজ এনেছেন—সেগুলি কোলকাতাতেই থাকুক। আপনি কালই রওনা হয়ে আরও সাত আটটা যন্ত্র—আর সাত আটজন সাহসী কর্মী আনুন।

আমি বাধা দিলাম। স্পষ্ট জানালাম যন্ত্র সাথে না নিয়ে আমি পথে পা বাড়াবো না। পরদিন "লম্বু' আমার যন্ত্রটা আমাকে দিলেন। হাবড়া ষ্টেশনে আমাকে রাতের ট্রেণে উঠিয়েও দিলেন।

পাৎলা ফুটফুটে ফর্শা চেহারা,—সাহেবী পোষাক পরা। ভাগলপুরের টিকেট কিনে চেপে বসলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। আমাশয়ে ভুগছি—শরীর কিছুটা দুর্বল। সাহেবগঞ্জের কিছু আগে পর্যন্ত জেগেই ছিলাম। তারপরই এল তন্দ্রা। হঠাৎ অনুভব করলাম চার পাঁচ জন লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার উপরে। ঠেলেঠুলে অতি কষ্টে উঠে বসে রিভলভারটা কোমর থেকে বের করলাম। কিন্তু সেফ্টী চাবী সরানোর আগেই ওরা আমার হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিল—মাথায় মুখে বেটনের বাড়ীতে আমাকে কাবু করে ফেলল। আমার হাতে চড়ল হাতকড়ি,—ঝমঝম করে পীরপৈতি ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো গাড়ী। পুলিশ দলের নেতা ছিলেন রায়সাহেব অন্নদা মিত্র,—আই, বি'র ডি, এস্, পি। সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় এলাম ভাগলপুরে। রেল পুলিশের থানায় রং বেরংএর পুলিশ গিজ গিজ করছে। বিহার গোয়েন্দা পুলিশের ডি, আই, জি মেরিয়ট সাহেবও হাজির।

অকস্মাৎ এত তোড়জোড়? মনে খটকা বাধল। আমার গ্রেপ্তার বিশ্বাসঘাতকতার ফল নয়তো? সন্দেহ হল লম্বুকে। কে এই লম্বু?—জানি না। জানবার উপায় নাই, -চেষ্টাও নিষেধ বিপ্লবী বিধিতে। এই বিধির সুযোগ নিয়ে গুণনিধি লম্বু দলে ঢোকেনি তো?— কে জানে!

মেরিয়ট সাহেব এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন "What's your name?"

"William Laurie"—জবাব দিলাম আমি।

তারপর বিভলভারটা জোর করে ওরা আমার পকেটে রেখে দিল। চীৎকার করে উঠলাম। সাহেব বললে—Shut up.

পরদিন প্রাতে নিয়ে গেল ভাগলপুর জেলে। গ্রেপ্তারের সময় বেটনের আঘাতে আহত হয়েছি! মাথাটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে। নির্জন সেলে স্থান হল আমার। ঢুকেই কম্বলের উপর গা মেলে দিলাম। রাজ্যের অবসাদ চেপে বসেছে সর্বাঙ্গে। বন্ধনের মাঝে মনটাও যেন মুক্ত। আর পুলিশের তাড়া নাই, অনাহার, অনিদ্রা, লোকের দৃষ্টিতে সন্দেহ,—আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি—কোন কিছুই নাই। কাজও নাই—আনুসঙ্গিক ঝামেলাও নাই। নিশ্চিন্ত। পড়লাম ঘুমিয়ে!

'হেই বোম্‌-গোলাওয়ালা বাবু!"

চীৎকারে জেগে দেখি জমাদারের সাথে কয়েদী পরিচারক ভাত নিয়ে ঢুকেছে সেলের সামনের প্রাচীর ঘেরা আঙিনাতে—যাকে বলা হয় ante-cell।

"বোম্‌গোলাওয়ালা।"

বাংলায় বিপ্লবী বন্দীর নাম স্বদেশীবাবু। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাথেই বিপ্লববাদ বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বিহারে বিপ্লববাদের পরিচয় ক্ষুদিরামের বোমায়। তাই বিহারে বিপ্লবীরা বোম্‌গোলাওয়ালা।

মুখ ধুয়ে কয়েদীর খানা খেলাম। ধান, পোকা আর পাথর মিশানো ভাত, শাক, ডাল আর চাটনী। আবার ঘুম। দু'তিনদিন পরে ঘুমের নেশাটা কাটলো। সুরু হল আমি কে তারই অনুসন্ধান।

ভুল বুঝবেন না। এটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'আমি কে' অনুসন্ধান নয়। পুলিশ প্রভুদের সাধনার লক্ষ্য একমাত্র আমার পরিচয়। দশবারো দিন পর বাংলা থেকে একদল গোয়েন্দা গেলেন ভাগলপুরে।

তাঁদের নেতা রায়সাহেব শশী ভট্টাচার্য্য—যিনি আমাকে রাজসাহীতে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই চিনলেন। নাম ধাম প্রকাশ হয়ে গেল।

চলতে লাগল মামলা।

বলতে ভুলে গিয়েছি আমি ভাগলপুর নাথনগরে থাকা কালেই মুন্টু আর বুলু মুজঃফরপুর মামলা থেকে ছাড়া পেয়ে স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ নিয়ে আসে ভাগলপুরে। বিভাংশু ওরফে বুলুর আগ্রহাতিশয্যে আমি তাকে অন্তরীণ আদেশ অমান্য করে ফেরারী হবার অনুমতি দিই। বসন্তবাবুকে বলে যাই ওকে সাথে করে কোলকাতা নিয়ে যেতে। কোলকাতা থেকে আমি যেদিন ভাগলপুর অভিমুখে যাত্রা করি ঠিক সেই দিনই বসন্ত বাবু দুটো রিভলভার আর বুলুকে নিয়ে রওনা হ'ন কোলকাতায়। এরই প্রায় পনর-ষোল দিন পর সেই বুলু এসে হাজির হল ভাগলপুর জেলে—আমারই পাশের সেলে। খবর পেলাম। যোগাযোগ স্থাপনও করলাম। রাতে ওর কাছেই শুনলাম গুরুজী মানে বসন্তবাবু, শশীদা, জয়ন্ত, আরও দু'তিনজন কর্মীর সাথে বুলু যে বাসায় ছিল সেই বাসাতে একদিন শেষ রাতে পুলিশ হানা দিয়ে সকলকে গ্রেপ্তার করে। আরও জানলাম ওদের কাছে যে অস্ত্র ছিল নন্দু আগেই তা' হাতিয়ে নেয়। সুতরাং পুলিশকে বাধা দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

নন্দুর সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হল। মনে হল আই বি অফিসে হানা দিবার প্রস্তাব একটা ছলনা। বিহারের বাছা বাছা কর্মী আর অস্ত্রশস্ত্র এই ছলনায় আয়ত্বে এনে সব পুলিশের হাতে সমর্পন করাই আসল উদ্দেশ্য। পরে জেনেছি ঢাকা কলতাবাজারের বিপর্যয়ের পর পুলিশের প্ররোচনায় দলের এক প্রাক্তন সদস্য অনন্ত মুখার্জী দলে ঢুকে সরাসরি কোলকাতা কেন্দ্রের নেতা হয়ে বসে। ভাজাহাটে

তাকে বাধা দিবার আর কেউ ছিলনা। ফলে সে আই, বি অফিসের পরামর্শমত আমাদের সকলকে ধরিয়ে দেয়,—তের চৌদ্দটা আগ্নেয়াস্ত্রও তুলে দেয় পুলিশের হাতে। এতে সে প্রায় ২০০০০ টাকা পুরস্কার পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল বাংলার বিপ্লবীরা—তার সমাপ্তি হয় এখানেই।

চার

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯ "ই" ও ১৯ 'এফ" ধারায় আমার বিচার চলছিল। প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে—পরে সেসনে। ৩০৭ ধারা টিকলো না। আমাকে গ্রেপ্তারের আনন্দে অন্নদাবাবু সাক্ষী যোগাড়ের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। পুলিশ ছাড়া নিরপেক্ষ সাক্ষী কেউ ছিল না। কিন্তু অস্ত্র আইনের বেলায় তথাকথিত নিরপেক্ষ সাক্ষীর অভাব হলনা। তারা সাক্ষ্য দিল—ভাগলপুর রেল পুলিশ থানায়—আমার দেহ তল্লাসী করে একটী Fully loaded Six Chamber রিভলভার পাওয়া গিয়াছে। জেরা, সওয়াল সবই করলাম নিজে নিজে। কিন্তু আইনের জ্ঞানতো নাই। সুতরাং আমার চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও চারশো টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। পাঁচ বছর! মনটা দমে গেল।

আবার সেই সেল। পরদিন প্রাতে আমার সাহেবী পোষাকের পরিবর্তে অঙ্গে চড়ল জাংগিয়া, কুর্তা, কয়েদী নম্বর দাগা টুপী,—আর গলাতে ঝুলাতে হল তিন সুতো শিকের মত মোটা হাঁশুলী আর কাঠের চাক্তি। বিলকুল বাঁদর। মনের তেজ চুব্‌সে গিয়ে চোখ ফেটে জল আসছিল আমার।

ডাক্তার সাহেব স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে লিখে দিলেন—Health indifferent,—Labour medium। পরেই সেলের মধ্যে দেখা দিল চাক্কী আর বারো সের গম। পিষতে হবে। প্রথম দিন চার-পাঁচ সের পিষেছিলাম। ফলে warning। দ্বিতীয় দিন ছয়-সাত সের। তৃতীয় দিন মাত্র সের তিন পিষেছি। ফলে পেয়েছি চার রাত হাত-কড়ির সাজা। আরও কত কি যে কপালে আছে কে জানে!

কিন্তু এরই মধ্যে একটা অঘটন ঘটে গেল জেলে। আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল তারই ফলে। ভাগলপুর জেলের জবরদস্ত জেলার পাঞ্জাবী মুসলমান মিঃ গোলাম মহীউদ্দিন। তার ভয়ে সকলে থর্ থর্ কাঁপতো। একদিন একটী কয়েদী জেলের খাবার বিরুদ্ধে নালিশ করে ডিভিশনাল কমিশনারের পরিদর্শন কালে। ফলং ধোলাই। সন্ধ্যায় কয়েদীটি মারা যায়। প্রাতে শব-ব্যবচ্ছেদ কালে দেখা যায় আঘাতের ফলে বেচারীর পিলে ফেটে মৃত্যু ঘটেছে। মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন বাঙ্গালী—Dr. S N. Sen। শুনলাম মহিউদ্দিনের সাথে তাঁর ছিল ঝগড়া। সুতরাং তিনি পিলে ফাটার কথাই লিখলেন Post-mortem রিপোর্টে। পুলিশ ঢুকল জেলে। কয়েদীরা এমন মোওকা কি আর ছাড়ে। পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিল জেলারের আদেশে বড় জমাদার আর একটী কালা পাগড়ী (Convict warder) কয়েদীটিকে প্রহার করেছে। জেলার গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর স্থলে এলেন মিঃ এস্, এন, রায়চৌধুরী জেলার হয়ে। তিনি আমাকে চাক্কী থেকে রেহাই দিয়ে দিলেন তরকারী কোটার ডিউটি। তরকারী মানে আলু-পটল নয়—মিঠকুমড়ো, মূলো আর আলুর শাক চোপানো ছিল আমার কর্ম।

তাই করে চলেছি মহোৎসাহে। এরই মাঝে এল ডাক জলপাইগুড়ি থেকে। অন্তরীণ আদেশ অমান্যের বিচার হবে সেখানে। চললাম

জলপাইগুড়ি জেলে। সাথে আছে চারজন সশস্ত্র সিপাহী আর তাদের নেতা পুলিশ ইনস্পেক্টর রায়সাহেব জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য। জলপাইগুড়িতে জগবন্ধু বাবুর শ্বশুররা থাকতেন। ষ্টেশনে নেমেই আমাকে সিধে নিয়ে গেলেন তাঁদের বাসায়। শীতের দিন। জাঙ্গিয়া, কম্বলের কুর্তা, কোমরে গামছা আঁটা, মাথায় কয়েদীর টুপী, আর গলায় ঝুলছে রিপিট করা হাঁসুলীর সাথে নম্বর দাগা কাঠের তক্তি। লিক্‌লিকে জিতেশের রাজবেশ। মাথায় রাজছত্র আর চামর-ব্যজনের অভাব পূরণ করেছে হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি আর পুলিশ-কর-ধৃত কোমরের দড়ি। এই অপরূপ সজ্জায় ভারী লজ্জা করছিল আমার—জগবন্ধুবাবুর শ্বশুরের বাসায় বালক বালিকা নর নারীর উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে। একটী ছোট্ট ছেলে এসে জগবন্ধু বাবুকে জিজ্ঞেস করলে—'জামাই বাবু। এই চোরটাকে কোথায় ধরেছেন?' সোনায় সোহাগা। ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে বলি—

—হা বিধাতঃ! এই ছিল ভালে মোর?—
যার জন্য করি আমি চুরি—
সেই মোরে বলে আজি চোর।

যাক্‌গে।

ঢুকলাম জলপাইগুড়ি জেলের সেলে। বিশ্রী সেল। একদম্ স্বল্প পরিসর—আর ভিতর দেয়ালগুলি আলকাত্‌রা লেপা। একেবারে আঁধার কুঠরী। উপায় নাই। থাকতেই হবে। চার পাঁচ দিন পর আমাকে নিয়ে গেল কোর্টে। ভারতরক্ষা আইনে স্পেশাল ট্রিবিউনাল বসেছে। সভাপতি বুনো জজ গার্লিক সাহেব। ট্রাইবিউনালের অপর দুই জন সদস্যের একজন সদর এস্, ডি, ও এবং স্থানীয় উকীল শ্রীঅনুকূল চৌধুরী।

বিচার সুরু হল। সরকারী সাক্ষী রাজসাহীর ডি, এস্ পি,

রাজসাহীর জেলার, দুজন কনেষ্টবল আর জলপাইগুড়ির জবরদস্ত পুলিশ সাহেব—বিপ্লবারি লোম্যান সাহেব। লোম্যান সাহেবকে বেশ কিছুটা জেরা করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা পুলিশ পাহারা হারিয়ে আমি যে দিন জলপাইগুড়ি আসি সে দিন পুলিশ সাহেব সদরে ছিলেন না,—মফঃস্বলে টুরে ছিলেন। লোম্যান সাহেবের ডাইরা থেকে এটা প্রমাণ হ'ল। সাহেব তো রেগে লাল। জামার আস্তিন গুটিয়ে মারে আর কি! আমি বিবৃতি দিলাম। বললাম নাটোর ষ্টেশনে ভিড়ের মাঝে মেলে চড়তে গিয়ে—আমি পুলিশের সঙ্গ হারিয়ে ফেলি। কিন্তু যথারীতি জলপাইগুড়ি পৌঁছে পুলিশ-সাহেবের বাসায় যাই। পুলিশ সাহেব ছিলেন না। আর্দালীরা আমাকে হাঁকিয়ে দেয়। ফলে আমি চলে যাই। ভারতরক্ষা আইনের অন্তরীণ-আদেশে আমাকে পুলিশ সাহেবের সাথেই সাক্ষাতের নিদেশ দেয়া হয়। কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সাথে সাক্ষাতের নির্দেশ নাই। পুলিশ সাহেব জেলার যে কোন অংশে থাকুন না কেন তিনিই পুলিশ সাহেব। তাঁকে না পেয়ে আমি চলে এসেছি। এতে আদেশ অমান্য হয় নাই।

কার কথা কে শোনে! ট্রাইবিউনাল রায় দিলেন আমার আরও ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড। ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে গেলাম জেলে। পর দিনই আমাকে ফেরত পাঠানো হল ভাগলপুর জেলে।

আবার তরকারী কর্তন আর সেল-জীবন যাপন।

দু সপ্তাহ পরেই জেলের সুপার হয়ে এলেন মেজর গিলেট। জাঁদরেল সাহেব। তাঁর কাছে বরাবর সেল-বাসের প্রতিবাদ জানালাম। বিচক্ষণ সাহেব। তিনি আমাকে সেল থেকে বের করে সাধারণ কয়েদীদের সাথে একত্রে থাকার আদেশ দিলেন। কিন্তু তরকারী কাটা কাজ কেড়ে নিয়ে কামারশালের Hammer man' অর্থাৎ হাতুড়ি পেটার কাজ দিলেন। ঠিক পরের দিনই মানের ফাইলে এক অঘটন

ঘটে গেল। Central Tower এর ঘন্টাধ্বনির সাথে সাথে তিন থালিয়া জল নিয়ে স্নান কার্য সমাধা করতে হয় কয়েদীদের। লম্বা লম্বা ড্রেণের দুইপাশে কয়েদীরা সারি দিয়ে বসে। আমিও বসেছি। কিন্তু ড্রেণ ভর্তি জল দেখে আমি পাঁচ-সাত থালি জল তুলে ঢেলেছি মাথায়। অকস্মাৎ পিঠের উপর পেট্টির আঘাত—আর মধুর ভোজপুরী সম্বোধন—'এ শারোয়া! কা করত হুয় রে ?'

একলাফে উঠে সিপাহীর পেট্টি কেড়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই দু'তিন জন কালা পাগড়ী আর মেট আমার উপর লাফিয়ে প'ল। বেশ কিছুটা ধোলাই অন্তে ঠেলে নিয়ে গেল সেলে। পরদিন বিচার। গিলেট সাহেবকে সব বুঝিয়ে বললাম। সাজা হ'ল দু' সপ্তাহ ডাণ্ডাবেড়ী। জেলার রায়চৌধুরী আমার দুঃখে ব্যথিত হলেন। কামার শালের কালাপাগড়ীকে (convict warder) বলে দিলেন আমাকে যথাসম্ভব হাল্কা কাজ দিতে। প্রায় এক মাস পর আমাকে কাজ দিলেন রেশম গুদামে। এখানকার চার্জে ছিলেন এক বাঙ্গালী ডেপুটী জেলার। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। নাম কাশীবাবু।

এখানে থাকার সময়েই আমি সিঙ্গাপুর বিদ্রোহের পাঠান সৈনিকদের সহিত পরিচিত হই। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা স্বর্গত বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা করেছিলেন তা' বানচাল হয়ে যায় কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায়। কিন্তু সে সংবাদ সময় মত সিঙ্গাপুরে পৌছেনা। ফলে সেখানকার রেজিমেন্টের বিপ্লবী অংশ বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমিত হয় সহজেই। সামরিক আদালতে বিদ্রোহী সিপাহীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁদেরই পাঁচজন ছিলেন ভাগলপুর জেলে। হাসি মুখ,—অত্যন্ত নির্ভীক—জীবনে বেপরোয়া। একজন একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—

"বাঙ্গালীকা য়্যাসা বুদ্ধি রহতা তো হমলোগ আংরেজকো ঘাস খিলাতা।'

আরো পরিচিত হই আরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নেতাদের সাথে। লবী উপাধ্যায়, রাম আশ্রয় উপাধ্যায হীরা সিং--বড় বড় জমিদার। সব বিশ বছর জেল। এঁদের প্ররোচনায় ও নেতৃত্বে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বর্বরতায় পশুদেরও হার মানিয়েছিল। জেলে একটা লঙ্কা, একটু তেলের জন্য এঁদের কাতরানি দেখেছি। বাড়ী থেকে মোটা মোটা টাকা আনাতেন এঁরা গোপন পথে সিপাহিদের মারফতে। তার প্রসাদে কিছুটা সুখ সুবিধার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

এই জেলে আরও দেখেছি বহু দুর্ধর্ষ কয়েদীকে। ষাট, সত্তর, আশী বছর মেয়াদ। পায়ে বেড়ী। তাই নিয়েই পালিয়েছে জেল থেকে।

কয়েদীদের কথা লিখতে গেলে মহাভারত হবে। তাই থাকুক ওসব কথা।

জেলার উপেনবাবু আমাকে নিয়ে একটু বিব্রতই বোধ করছিলেন। আড়াই হাজার কয়েদীর মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী আমি। স্বাস্থ্য ভাল নয়—জেলের ডাল রুটীর কৃপায় লেগেই আছে আমাশয়। তার উপর বড় সাহেব মেজর গিলেটের সদয় দৃষ্টি আছে আমার উপরে। আমার কবে ঘানি, চাক্কি, হাতুড়ীর কাজে ঠেলে দেয় তার ঠিকানা নাই। সুতরাং এবারে জেলার বাবু বাংলার মাল বাংলায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থায় লেগে গেলেন। ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি আবার এলাম জলপাইগুড়ি জেলে। সিভিল সার্জেন মেজর লয়েড্ জেলের বড় সাহেব। আইরিশ ম্যান। কড়া,—কিন্তু আইনানুগ। আমাকে সেল থেকে বের করে কাজ দিলেন টুকরী খানায়। চা বাগানের জন্য বেতের টুকরী বানানো এই জেলের বড় কাজ। প্রতিদিন দশটা করে'

টুকরী বানিয়ে দিতে হবে আমাকে। পুরাতন কয়েদী বিদেশী নস্ক বেতের কাজের ওস্তাদ। সেই আমার টুকরীগুলোর "খো" তুলে দিত। আমি গাঁথতাম। কাজ পুরো হতনা কোন দিনই। জেলার বাবু মহাদেব রায় কিছুই বলতেন না। ডেপুটী জেলার ছিলেন শ্রীঅমূল্য মুখার্জী। ইনি পরে চাকুরী ত্যাগ করে স্বর্গত শরৎ বসুর সেক্রেটারী হয়েছিলেন। অমূল্য বাবু আমার সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন।

কিছুদিন পর অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করে জেলে ঢুকলেন চট্টগ্রামের ক্ষেত্র সেন। দেহে মনে অত্যন্ত তেজস্বী। বাইরে পরিচয় ছিলনা। এবারে বেশ জমে গেলাম ক্ষেত্রদার সাথে। এক মাসের মধ্যে আরো দুজন অন্তরীণ বিধি ভঙ্গ করে এলেন জেলে। তাঁদের একজন নগেন্দ্র শেখর চক্রবর্ত্তী ওরফে নগা গালপোড়া। অপর জনের নাম বগলাপ্রসন্ন মজুমদার। শহীদ তারিনী মজুমদার ওরফে ষ্টারের কাকা,— ৺বসন্ত মজুমদারের জ্ঞাতি ভাই। বগলা আর ইহ জগতে নাই। আততায়ীর হাতে মৃত্যু হয়েছে তার,—পারিবারিক কলহের শোচনীয় পরিণতি। নগেন বাবু ছিলেন যুগান্তরের—আমরা তিন জন অনুশীলনের। তবু হৃদ্যতার অন্ত ছিলনা আমাদের মাঝে। ওঁদের তিন জনেরই মেয়াদ হয়েছিল তিন মাসের। দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনমাস। মুক্তি পেয়ে তিন জনই গেলেন বাইরে। আবার আমি একা। সকলের শেষে বগলা যেদিন চলে গেল সেদিন আমার মন দুঃসহ বেদনায় মুহ্যমান হয়েছিল। বিদেশী নস্ক আমাকে দেখে বলেছিল "স্বদেশী বাবুকে আজ 'মাওড়া" "মাওড়া" (মা-হারা) লাগতিছে।" আমার চোখ ফেটে জল এসেছিল ওর কথায়।

বোধ হয় মাস দুই পরে আচম্বিতে আকাশ ভেঙ্গে প'ল আমার শিরে। একদিন প্রাতে জেল অফিসে আমার ডাক প'ল। গিয়ে

দেখি মেজর লয়েড। তিনি একখানা টাইপ করা কাগজ আমার দিকে দিয়ে বললেন "Have you written such a letter to a freind in Rajshahi Jail?"

কাগজ খানা হাতে নিয়ে দেখি আমারই লেখা চিঠির টাইপ করা কপি। মনের পরদায় ভেসে উঠল কৃত কর্মের ছবি। রাজসাহীতে সেন্ট্রাল জেল। জলপাইগুড়ি জেলা জেল থেকে সেখানে সর্বদা কয়েদী যাতায়াত করে। রাজসাহী জেলে তখন শ্রীপ্রফুল্ল রায় ওরফে সর্দার, ৺নরেন ব্যানার্জি ওরফে কর্তা, ৺সতীশ সিংহ প্রভৃতি বন্ধুরা দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। তাঁরা জেল ভেঙ্গে পলায়নের আয়োজন করছিলেন। আমার কাছেও কয়েদীর মারফত খবর পাঠিয়েছিলেন পলায়নের ব্যবস্থা করতে। তারই জবাবে আমি একখানি চিঠি লিখি। তাতে ছিল—

Dear brother,

I have duly received your instructions, re : escape from jail. I do not consider it advisable for the following reasons. Our organisation, which was of a unitary character, has been totally shattered. Links between different units have been lost. Enemies have infiltrated in the organisation. Almost all the active members have been arrested. In a word, our failure is complete. I think it is the surest fruit of a defective organisation. We have no root in the soil. Politically conscious people adore us from a distance. But they shudder to be near us. Fantastic stories have been built on our activities. The political consciousness of the common

people is so low that the proper appreciation of our ideal is out of question. Still, the people's agony is there. So I think a sweeping national upsurge has to come over the country as in the Swadeshi movement which gave us strength to march so far. So we should wait with eager eyes for that movement. If we get out now, we are sure to be burden on our freinds or be re-captured before long. So, please, desist and wait.

Yours affly

Chhoto-Philo.

একটী কয়েদীর মারফতে চিঠিখানি রাজসাহী জেলে প্রফুল্লদা'র কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু রাজসাহী জেলের ভিতরে তার কাছে চিঠিখানি ধরা পড়ে। গুতোর চোটে সে স্বীকার করে আমি তাকে চিঠিখানি দিয়েছি প্রফুল্লদাকে দিতে। অস্বীকার করে লাভ নাই। সুতরাং শান্তভাবেই মেজর লয়েডের প্রশ্নের জবাব দিলাম—Yes, I have written the letter.

জেলার মহাদেব বাবু বললেন –তোমাকে ছেলের মত দেখতাম – আর তুমি আমার সার্ভিসে দাগ লাগিয়ে দিলে! ব্যথিত হলাম আমি। কিন্তু ঢিল ছুড়েছি...ফেরাই কি করে!

আমার স্থান হল সেলে। একদিন ডেপুটী জেলার অমূল্যবাবু এসে চুপি চুপি বললেন I. G. Prisons—আমাকে ত্রিশ ঘা বেত আর ছয় মাস সেল-বাসের আদেশ দিয়েছেন। তবে জেল সুপার মেজর লয়েড পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি লিখেছেন। তিনি সুপারিশ করেছেন—The boy, is sufficiently learned and intelligent. He should rather be released and sent to England for higher education.

তবু ত্রিশ ঘা বেতের খবরে মনটা দমে গিয়েছিল। ভাগলপুর জেলে ত্রিশ ঘা বেতের নমুনা চোখের উপর দেখেছি। টিকটিকিতে (flogging triangle) বেঁধে প্রায় ত্রিশ হাত দূর থেকে ছুটে এসে যখন পাছার উপর চকচকে মলাকা বেতের ঘা মারে,—দুর্ধর্ষ কয়েদীও হিমসিম খেয়ে যায় সে আঘাতে। পাঁচ ছয় ঘা'র পর প্রায়ই রক্ত ছোটে আর সংজ্ঞা লোপ হয়। মনের চোখে দেখি আর শিউরে উঠি।

আট দশ দিন পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাক পড়ল জেল গেটে। কোলকাতা থেকে সার্জেন্ট এসেছে—আমাকে নিয়ে যেতে প্রেসিডেন্সি জেলে। আয়োজন দেখে মনে হল বেত্রাঘাতের সূচনা। বিদায়কালে জেলার মহাদেব বাবুকে বললাম "আমাকে ক্ষমা করবেন জেলার বাবু! এতটা যে হবে ধারণা করতে পারিনি।" মহাদেব বাবুর চোখ ছলছল্ করে উঠেছিল—অমূল্যবাবু প্রাণ ঢেলে আমার করমর্দন করেছিলেন।

অজ্ঞাত দণ্ডাদেশ বরণ করতে বালক বন্দী—দেশী বিদেশী পুলিশ পরিবৃত হয়ে যাত্রা করল প্রেসিডেন্সী জেল অভিমুখে।

পাঁচ

প্রেসিডেন্সী জেলে পৌছানোর পর আমাকে হাজির করা হল জেল সুপার-লেঃ কর্ণেল হ্যামিল্টনের সম্মুখে। তিনি বললেন "আই, জির আদেশে সাজার জন্যে এখানে আনা হয়েছে—সে কথা জানো?"

জবাব দিলাম—জানি।

সাহেব বললেন—"তোমাকে ছয়মাস সেলে কাটাতে হবে আর এ পর্যন্ত যে মাফি (remission in sentence) পেয়েছ তা কাটা যাবে।" সাহেব এখানেই থামলেন। আনন্দে আমার মন লাফিয়ে উঠল। তবে ত্রিশ ঘা বেতের সাজা বাতিল হয়েছে।

জেলার রায়ান সাহেব পৌছে দিয়ে গেলেন প্রখ্যাত চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর (Foty-four cells) ৩৩নং সেলে। সেলের দোর বন্ধ হল—সামনে প'ল একজন সার্জেন্টের পাহারা। আবার সেই জেল-জীবনের নির্জনতা। মাথা নীচু করে ভাবছি। হঠাৎ দৃষ্টি পল মেঝের টালির উপর। কি যেন লিখা আছে। শুধু একখানার উপর নয়—প্রায় সক ক'খানা টালির উপরই। "কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—পুলিন দাস, "বিদায় দেমা প্রফুল্ল মনে—চললাম আমি আন্দামানে"—ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী, "ভাই! মাকে তোমাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া জন্মের মত চলিলাম—বীরেন দত্তগুপ্ত—আরও কত মাতৃপূজার আত্মাহুতি মন্ত্র—লেখা আছে টালিতে টালিতে। আমার মনে হল এতো নির্জন কারা প্রকোষ্ঠ নয়—এযে দেশপ্রেমের প্রদর্শনী!

একদিন রাতে শুয়ে আছি কম্বলের উপর। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন ডাকছে চাপা গলায়। ত্রস্তে উঠে দেখি একজন জমাদার—একচোখ কাণা। জমাদার বললেন—আপকা ভাই—প্রভাসবাবু ইয়ে চিট্টি ভেজিন হ্যয়। দেখিয়ে।

দাদা! আমার দাদা এই জেলে! তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চিঠি নিলাম। বিদ্যুতের আলোতে পড়লাম—তুমি এসেছ—খবর পেয়েছি। কোন চিন্তা নাই। এই জেলে আমরা আরও ছয়জন আছি। সময়মত দেখা হবে। প্রেসিডেন্সী জেলের লাইব্রেরী ভাল। সুপারের কাছে বই চাইবে।

এতো দাদারই হস্তাক্ষর! আনন্দে আমার মন নেচে উঠল। দাদাকে দেখার জন্য একটা তীব্র আকাংখা জাগল মনে। কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই,—আমি সেলে বন্দী; সেলের সামনে সার্জেন্ট পাহারায়।

ইতিমধ্যে আমার সেলে কাজ ঢুকেছে। প্রেসিডেন্সী জেলে জুটমিল ছিল চট তৈরী হত। চটের ছোট বস্তা সেলাই করা এ

জেলের অন্যতম প্রধান কাজ। পনর টুকরো চট,—একটা ঠেলা, পেটে সূঁই আর সুতলী দিয়ে গেল জমাদার আমাকে। একদিন একটী কয়েদীকে নিয়ে এসে বস্তা সেলাইএর কায়দাও শিখিয়ে গেল। হাতের চেটোয় ঠেলা (দুটো কানওয়ালা লোহার চাক্তি) বেঁধে তা দিয়ে সূঁচ ঠেলে সেলাই কার্যে আত্মনিয়োগ করলাম। কিন্তু দিনের শেষে আঁকা-বাঁকা হয়ে উৎরালো চার-পাঁচটা বস্তা। আমি সাফল্যে উৎফুল্ল হলেও Task-taker কম কাজের রিপোর্ট দিলেন। একদিন, দুদিন. তিনদিন। প্রথমে warnnig তাহার পর চাররোজ মাড়ভাত (Penal diet) ততঃ! চার রাত হাতকড়ি। অবশেষে প্রতিবাদ জানালাম বড় সাহেবের কাছে। বাচ্চা দেখে বোধ হয় সাহেবের দয়া হয়েছিল। তিনি বস্তা সেলাইএর বদলে "Jute-teasing" অর্থাৎ এক বাণ্ডিল পাটের ফেঁসো ছাড়ানোর কাজের ব্যবস্থা করলেন। সুযোগ বুঝে একদিন সাহেবের কাছে বই চাইলাম লাইব্রেরী থেকে। জেলার রায়ান সাহেব বাধা দিয়ে বললেন - জেলে সাজা হলে তিন মাসের মধ্যে এ সুযোগ পাওয়া যায় না।

আমি বললাম "But good books effect mental reform. You surely want it.—

বড়সাহেব খুশী হয়ে বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে বই পড়ার আদেশ দিলেন। আমিও আস্ত পেটুকের মত গ্রন্থের পর গ্রন্থ গিলতে লাগলাম। "Fourteen years among the wild tribes of Afgan frontier", "Life and times of king Edward VII", Scott এর Kenilworth, Oscar Wilde এর De Profundis, Salome প্রভৃতি যা পেয়েছি তাই পড়েছি। বেশ কেটেছিল দিন—দিনে পাটের জট ছাড়াই আর রাতে পড়ি। এইভাবে সচ্ছন্দে পাড়ি দিলাম জেলের ছয়মাস।

তারপর সেল থেকে বাহিরে এসে জনারণ্যে ঢুকলাম। মস্ত বড় জেল। আড়াই হাজার কয়েদী। প্রায়ই কোলকাতার নামকরা দাগী মাল। এক একজন এক এক দিকে স্পেশালিষ্ট। মার দাঙ্গা লেগেই আছে। ধোলাইও চলে অবিরত। এরই মধ্যে কাণা জমাদারের কৃপায় দাদাদের সাথে দেখা হ'ল। দাদা ছাড়া এই জেলে তখন ছিলেন বীরভূমের শ্রীনিবারণ ঘটক। সাত সাতটী মশার পিস্তল রাখার অপরাধে, পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষের শিষ্য—মহান্ উদার প্রাণ। দলের গণ্ডী এঁর হৃদয়কে সঙ্কুচিত করেনি কোন দিন। আজও মাঝে মাঝে তাঁর স্নেহসিক্ত আশীর্বাণী পাই। আমি যেন সেই ছোট্ট জিতেশই রয়ে গিয়েছি তাঁর কাছে। প্রগাঢ় স্নেহের এই under-estimate বেশ লাগে আমার কাছে।

পরিচিত হলাম শ্রীতারাপ্রসন্ন দে ওরফে টিপু সুলতানের সাথে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল গৌর বর্ণের মানুষটী। স্বল্প-ভাষী। এঁর সব কাজেই একটা পরিচ্ছন্নতার ছাপ আছে। একদিন তিনি হেসে বল্লেন—মিথ্যে মিথ্যি তিন বছরের সাজা দিয়েছে আমাকে। ওতে ওরাই ঠকেছে। হিসাবে প্রতি বছরে পড়েছে নয়টা—আবার একটা ফাউ।"

প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। দাদা বুঝিয়ে দিলেন—তারা বাবুর খুন—ডাকাতির সংখ্যা হচ্ছে আঠাইশ। অথচ সাজা মাত্র তিন বছরের।

শ্রীযুত যুগলকিশোর দত্ত সালকিয়া স্যুটিং কেসে পাঁচ বছরের দণ্ড ভোগ করছিলেন। কোলকাতার আহিরীটোলায় নিমু গোঁসাই লেনে বাড়ী তাঁর। আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমার কারাজীবনের ক্লেশ লাঘবের জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছেন তিনি।

ঢাকার একটী ডাকাতি মামলায় সাত বছরের কারাদণ্ডের আদেশ হয় শ্রীপ্রফুল্ল রাহার ও শ্রীঅনিল ঘোষের। তাঁরাও ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। প্রফুল্লবাবু দাদাকে গুরুদেবের মত শ্রদ্ধা করতেন। যুক্তি

পেয়ে তিনি রাজসাহীতে দাদার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে আত্ম-নিয়োগ করেন।

জেলের জেনানা ফাটকে ছিলেন নিবারণদা'র মাসীমা—বীরভূমের মহীয়সী মহিলা দুকড়িবালা দেবী। তাঁকে দেখিনি। কিন্তু নিবারণদা'র কাছে তাঁর কথা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠত।

ঢাকার শ্রীমোহিনী ঘোষও ছিলেন এই জেলে। এক ডাকাতি সম্পর্কে এঁরও পাঁচ বছর জেল হয়েছিল।

বেশ কাটছিল দিন। গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলা সুস্থি (rest) এক ঘণ্টা। এই সময়টা কয়েদীরা খেয়ে দেয়ে আরাম করে নিজ নিজ ওয়ার্ডে। কাণা জমাদারের সাহায্যে এই সময়টায় আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাশুনা করতাম। ধরা পড়লে আমাদের সাজাতো হবেই—জমাদারও বাদ যাবে না। জেনেও এ বিপদের বোঝা ঘাড়ে নিয়েছিল কানা জমাদার।

আর একজন কয়েদী আমাদের সাহায্য করেছেন নানা প্রকারে। তাঁর নাম শ্রীহেম সেন,—বড় একটা ৪২০ নং ধারার মামলায় এঁর পাঁচ বছরের জেল হয়েছিল। বেশ শিক্ষিত। দণ্ডভোগ কালে এঁর কাজের ব্যবস্থা হয়েছিল জেল অফিসে।

ছোট জেল-ডাক্তার শ্রীজিতেন চ্যাটার্জিও এক সাথে দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করে মেলামেশার সুযোগ দিতেন মাঝে মাঝে। আজ দিন শেষে এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

আমি দিনের বেলা কাজ করতাম চটভাঁজে (Bag sorting shed) আর রাতে শু'তাম জাল ডিগ্রীতে। ঘরের মধ্যে তারের জাল দিয়ে তৈরী খাঁচা,—কোন রকমে একটা মানুষ শুতে পারে। ভয়ানক জিনিষ। রাতে জালের ছাদ থেকে শত শত ছারপোকার অবতরণ ও অধঃপতন,—ততঃ হতভাগ্য কয়েদীর শোণিত-শোষণ। প্রথম প্রথম

ঘুমাতে পারতাম না মোটেই—মনে হত পাগল হয়ে যাব। পরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বোধ হয় বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। বিবেক আর বোধশক্তি বহু বিষয়েই ভোঁতা হয় জেলে।

নিবারণদা, দাদা যুগলদা, প্রফুল্লবাবু পর পর মুক্তি পেয়ে গেলেন বাহিরে। এল তারাদা'র মুক্তির দিন। তিনি তাঁর থালা বাটি আমাকে দিয়ে আমার থালা বাটী জেল গেটে জমা দিলেন। লোহার থালা বাটীকে মেজে মেজে তারাদা নিকেলের মত চক্‌চকে করে তুলেছিলেন। তার একটা নিজস্ব সম্পদ তারাদা দিয়ে গেলেন আমার হাতে। সেটা হচ্ছে অভিনব অপরূপ চিরুণী। ঝাঁটার কাঠি ছোট ছোট করে ভেঙ্গে পাটের ফেঁসো দিয়ে পরিপাটী করে বেঁধে তৈরী হয়েছে "স্বদেশী বাবুর চিরুণী"। এই চিরুণীর সাথে তারাদার যে মমত্ববোধ আর অভ্যাসের পারিপাট্য ছিল তাই তিনি সঁপে দিলেন আমার হাতে। কবিগুরুর ভাষায় আমি—"স্নেহের সে দানে, বহু সম্মানে,—বারেক ঠেকানু মাথা।"

অনিলবাবু, মোহিনী বাবু আর আমি রয়েছি জেলে। বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।—বাহিরে যাবার আগ্রহও তীব্র রূপে দেখা দেয় মনের মধ্যে। কয়েদীদের মুখে মুখে ফেরে "জুগ্‌লী র (জুবিলী) কথা। মুক্তি পাবে সকলেই—প্রবর্তিত হবে নূতন শাসন। বিচার-বুদ্ধি বলে—মিথ্যে কথা; মন তা' মানে না। হঠাৎ একদিন শুনলাম রাজসাহী জেলের কয়েদীরা "জুগ্‌লী" আদায় করেছে,—'বন্দেমাতরম্‌' 'গান্ধী মহারাজ কী জয়' রবে সব কয়েদী জেল ভেঙ্গে বেরিয়েছে। ব্যাপার কি জানবার চেষ্টা করছি। অকস্মাৎ একদিন প্রাতে আমাদের তিনজনকে নিয়ে পুরে দিল সেলে! আবার সেই সেল। বুঝতে বাকী রইল না অঘটন কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই। প্রায় দিন পনের পর সাত আটজন সশস্ত্র সিপাই আর সার্জেন্টের পাহারায় পায়ে হাঁটিয়ে আমাদের

নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সী থেকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। আমাদের স্থান হল ইউরোপীয়ান সেলে—পরে যা Bomb yard নামে খ্যাত হয়েছে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই বুঝলাম রাজসাহী জেল ভাঙ্গার পর সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন প্রদেশের সকল জেলের রাজনৈতিক কয়েদীদের সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা হবে আলীপুর জেলের সেলে—ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফল্‌সের গুর্খা সৈন্যদের প্রহরাধীনে।

বিভিন্ন জেল থেকে রাজনৈতিক কয়েদীরা আসতে লাগলেন। ত্ব'সপ্তাহের মধ্যেই নরক গুলজার। হলুদবেড়ে ডাকাতি মামলায়—দণ্ডপ্রাপ্ত শ্রীগোপেন্দ্রলাল রায়কে আন্দামান থেকে ফিরিয়ে এনে আলীপুর সেণ্ট্রালেই রাখা হয়েছিল। আমরা আলীপুর আসার পরদিনই তিনি আমাদের সাথী হয়েছিলেন। মেদিনীপুর থেকে এলেন শ্রীসুরেশ ভরদ্বাজ ওরফে পালোয়ান, শ্রীপ্রফুল্ল রায় ওরফে সর্দার ও ৺সতীশ সিংহ, ঢাকা থেকে এলেন শ্রীমথুর চক্রবর্তী, শ্রীঅতুল দত্ত, শ্রীসুধীর মজুমদার—আর শ্রীহরি চৈতন্য দে,—ঢাকায় কলতাবাজারে যাঁর আশ্রয়ে অবস্থান কালে কুমিল্লার তারিণী মজুমদার ওরফে ষ্টার—আর মুর্শিদাবাদের নলিনী বাগচী ওরফে পাব্লিশার পুলিশের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে শহীদ হয়েছেন। সেই অপরাধে হরিবাবুর বিশ-বছর মেয়াদের জেল হয়।

গোপেনবাবু ছিলেন আমাদের মধ্যে প্রবীণতম। শুধু বয়সে নয়,—বিদ্যায়, বুদ্ধিতেও। সেই যুগেও একান্ত প্রগতিশীল ছিল তাঁর মন। সামাজিক ন্যায়-বিচার, নারীর অধিকার সব বিষয়েই প্রগতিশীল দৃঢ় ও সুস্পষ্ট মতবাদ পোষণ করতেন তিনি। বহু উপকৃত হয়েছি আমি তাঁর সংস্পর্শে এসে।

সদা প্রফুল্ল ছিলেন প্রফুল্ল দা। বাপ-মা'র দেয়া নাম সার্থক হয়েছে

তাঁর ক্ষেত্রে। জঙ্গী বিভাগের সর্দার—একেবারে হাসিখুসীর অবতার। ঢাকা ষ্টেশন সুটিং মামলায় বার বছর সশ্রম কারাদণ্ডেব আদেশ হয়েছে তাঁব। ঐ মামলাতেই বন্ধুবর সতীশ সিংহেব পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সতীশ আর ইহজগতে নাই।—দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল সে।

সুধীর ছিল আমার সহপাঠী বন্ধু। পাবনা জেলার লাহিড়ী মোহনপুরের লোক—রাজসাহীর ছাত্র। বেশ মজবুত চেহারা। ঢাকায় পুলিশ যখন বাসা ঘেরাও করে ভোজালি নিয়ে তাদের আক্রমণ ও আহত কবার অপরাধে মথুরা বাবুর, অতুল বাবুর আর তার পাঁচ বছর হিসেবে জেলের আদেশ হযেছে। ভরদ্বাজের কথা বহুবার বলেছি। অস্ত্র আইনে তাঁর চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। লেখাপড়ার দিক দিয়ে তিনি বেশীদূব অগ্রসব হতে পারেননি। কিন্তু দেহে-মনে অসীম শক্তি, প্রখর বুদ্ধি আব অপূর্ব সংগঠন-দক্ষতায় তিনি অনায়াসেই বিপ্লবীদলের পুরোভাগে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইনি আজ বাঁকুড়া জেলার সোণামুখীতে অগতির গতি হোমিও প্যাথির শরণ নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। এই কুশাগ্রবুদ্ধি দৃঢ়চেতা মানুষটীর অসাধারণ ক্ষমতা অবহেলায় পড়ে রইল একপাশে। নিযোজিত হল না দেশ গঠনের কাজে।

সব চেয়ে মজার কথা এই যে বিগত যুগের এই বিপ্লবীদের—অবস্থা "না ঘরকা—না ঘাটকা।" ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস এঁদের দেশসেবা আর যোগ্যতার মূল্য নির্ধারণ করেছেন মাসিক কুড়ি টাকা। তা'ও আবার নিষ্ক্রিয়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এদিকে যাঁরা বামপন্থী, মার্ক্স ও লেনিনবাদের সুচারু ব্যাখ্যাই তাঁদের কাছে বিপ্লবী যোগ্যতার মাপকাঠী। যেহেতু অগ্নিযুগের এই সব কুশলীবিপ্লবীর সে যোগ্যতা নাই—সুতরাং বামপন্থীদের কাছে তাঁদের

পরিচয়—"টেরোরিষ্ট আমদের দাদা।" কিন্তু এটাও ঠিক, বিপ্লব-কর্মের ধারা বদলালেও বিপ্লবী-কর্মীর চরিত্র বদলায়নি। সেই ত্যাগ, সেই নিষ্ঠা, সেই সাহস, সেই বুদ্ধি সব কিছুরই আগের মতই প্রয়োজন আজও। আবার নিষ্ঠা আর কল্যাণকামনা মূলে থাকলে বিপরীত ধর্মী মতও মিলে যায় ক্ষেত্র বিশেষে। জীবনের মূল্যবোধ আর সামাজিক সুবিচারের মূল লক্ষ্যে মার্ক্স আর গান্ধী অভিন্ন। তেমনি আজের দিনেও দেখতে পাই পৃথক পথের যাত্রী হলেও বহু ক্ষেত্রে বিনোবা ভাবেজীর আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে বামপন্থীদের সাথে।

যাক্। অকস্মাৎ একদা আই. জি, প্রিজনস্ লেঃ কর্ণেল থমসনের আবির্ভাব হল আমাদের অঙ্গনে। বাঁকা চোখ আব চোখা কথায় বহরেই বুঝলাম লোকটী সুবিধার নয়। পরদিন প্রাতে থমসনী আচরণ আরও ভাল ভাবে বোঝা গেল। আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে চাকী আর একমণ করে মটর কলাইএর বস্তা এসে নামল প্রত্যেক সেলের দরজায়। ভাঙ্গতে হবে। সশ্রম কারাদণ্ড তো। ইয়ারকী চলবেনা।

আমাদের মাঝে গোপেনদা, সতীশ আর আমি দুবলা। একমণ কলাইভাঙ্গা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু প্রফুল্লদা, অতুলবাবু আর সুধীর নিজেদের কাজ সেরে আমাদের ডাল ভাঙ্গাতেও সাহায্য করতেন। অবশ্য ভাঙ্গা মটর ভিজিয়ে নুন দিয়ে চিবিয়ে আমরা আমাদের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করতাম মাঝে মাঝে।

প্রায় একমাস পরে একদিন প্রাতে জেল-সুপার ডাঃ ম্যাশ যখন রোঁদে এসেছেন আমাদের ওয়ার্ডে প্রফুল্লদা চোখ মিট মিট করতে করতে তাঁর সামনে হাজীর হলেন। বেশ শান্ত স্বরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বুঝিয়ে বল্লেন—"দেখ সাহেব আমার ফাঁসী হবার সম্ভাবনা ছিল। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতই হয়েছিলাম। আজই যদি চাকীগুলো

এখান থেকে সরিয়ে নেয়া না হয় কাল সকালে যে কোন অফিসরের মাথায় আমি চাকী ভাঙ্গব।" সাহেব অবাক্।

ডাঃ য়্যাশ আমার পুরাতন বন্ধু। প্রথমবার গ্রেপ্তারের পর আমি যখন রাজসাহী জেলে ছিলাম—তিনি তখন সেখানকার জেল-সুপার। সুতরাং আমাকে চিনতেন। এবারে আমি এগিয়ে গিয়ে সাহেবকে বললাম—"আপনার মত একজন উন্নত চরিত্রের ন্যায়-পরায়ণ লোক নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থা সহানুভূতির চোখে দেখবেন। আপনার কাছ থেকে আমরা ন্যায় বিচার পাব এই আশা রাখি।" ব্যাস্—কাম্‌ফতে। গরম নরম মিলিয়ে কাজ উদ্ধার হল। চাকী সরল—এলো এক হাজার লেফাফা তৈরীর কাজ। গোপেনদা আলীপুর জেলের কয়েদী। একাজ তাঁর রপ্ত আছে। তিনিই আমাদের লেফাফা তৈরীর কারীগরী শিখিয়ে দিলেন।

এই ভাবেই দিন কাটছে। বাহিরে নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী অসহযোগে আন্দোলন সুরু হয়েছে। প্রথম দলে কারাবরণ করলেন বরিশালের তিনজন যুবক—শ্রীশচীন সেন, শ্রীশৈলেন সেন ও শ্রীনরেশ ঘোষ। তার পরই এলেন দার্জিলিংএর গুর্খানেতা স্বর্গত দলবাহাদুর গিরি। গিরিজী অদ্ভুত মানুষ। দৈহিক দুর্বল কাঠামোর মাঝে ছিল এমন একটি মানুষ যিনি দৃঢ়তায় অনমনীয়, নিষ্ঠায় অনুপম। নেপাল সরকারের অধীনে মোটা টাকা বেতনে তিনি কাজ করতেন। অনেক-গুলো ছেলেমেয়ে, সংসারের বিরাট দায়িত্বের বোঝা ছিল তাঁর মাথায়। কিন্তু [illegible] [illegible] পেছন পানে না চেয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন অসহযোগ [illegible] [illegible] এই দৃঢ়চেতা নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিককে [illegible] [illegible] [illegible]ছিলাম। ধীরে ধীরে আমি গিরিজীর খুব [illegible] [illegible] [illegible]। আমাদের দলের আদর্শ আর কর্মপন্থা নিয়ে [illegible] আলোচনা তাঁর সাথে। গিরিজী আকৃষ্ট

হলেন। জেলের বাহিরে এসে তিনি আমার দাদা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর মারফত আমরণ যোগাযোগ রেখেছিলেন আমাদের দলের সাথে। গিরিজীর কারামুক্তি কালে আমার দাদার সাথে আলাপ-আলোচনা করবার অনুরোধ আমি তাঁকে করেছিলাম।

তাঁর মুক্তির কিছুদিন আগেই অসহযোগ বন্দীদের আমাদের কাছ থেকে পৃথক করে পাশের ব্লকে রাখা হয়। মেলামেশার উপায় ছিলনা। কিন্তু গুর্খানেতা গিরিজী ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফলের গুর্খা সৈনিকদের বোলচালে বাধ্য করে মেলামেশার ব্যবস্থাটা অব্যাহত রেখেছিলেন।

নির্বিঘ্নে দিন কাটছে। দিনের বেলায় আড্ডা জমিয়ে ভালই থাকতাম—রাতে আলাদা আলাদা সেলে। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের সেলগুলিও ভাল,—আলীপুর জেলের খাবার ব্যবস্থাও ভাল। জেলের নিজস্ব বাগান না থাকায় আলুর শাক, মুলোর শাক আর কলাগাছ তরকারীরূপে ব্যবহৃত হত না। কণ্ট্রাক্টর শাকশব্জী সরবরাহ করতেন —তা যে প্রকারেরই হোক। আলু, মিঠ্‌কুমড়ো আর পেঁয়াজ মিলতো তরকারীতে। ডাল-সম্বারার-লঙ্কা আর পেঁয়াজের খোসা নিয়ে গোঁসা করতে হতনা অন্য জেলের মত। লঙ্কা-পোড়ার টুকরো আর ঝলসানো পেঁয়াজের খোসা আপ্‌সে পাতে পড়ত মাঝে মাঝে। সুতরাং সুখেই ছিলাম বলতে হবে।

আট দশমাস পরে অকস্মাৎ একদিন জেল গেটে আমার ডাক পড়ল। আমাদের ইয়ার্ড থেকে একজন সার্জেন্টের সাথে যাচ্ছি জেল গেটের দিকে। সার্জেন্ট চুপি চুপি বললে—your release! রিলিজ! মুক্তি? অসম্ভব! এখনো যে দেড় বছর বাকী,—চারশো টাকা জরিমানার দরুণ এক বছর,—ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্টের দরুণ ছয়মাস। ইচ্ছে হয় প্রাণ খুলে হাসি,—লম্ফঝম্পে হাজির হই জেলের গেটে।

জেল-অফিসে ঢুকেই দেখি দাদা বসে। আরও তিনজন—দুটী ছেলে আর ছাই রংএর কোট গায়ে—টাক্ পড়া মাথা একজন ভদ্রলোক। কাউকেই চিনিনা।

জেল সুপার ডাঃ ম্যাশ বললেন "You will be released just now. I hope you will be a peaceful and useful citizen henceforth."

বিস্মিত হয়ে বললাম "But my date of release is far off hence !"

দাদা জানালেন ব্যারিষ্টার বি, সি, চাটুয্যের উদ্যোগে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টাররা চাঁদা তুলে আমার জরিমানার চারশো টাকা জমা দিয়েছেন। আর যেহেতু ভারত সরকার "ভারত রক্ষা আইন" প্রত্যাহার করেছেন সেইহেতু ভারত রক্ষা আইনের দণ্ডাদেশ কার্যকরী হতে পারে না এই যুক্তি দেখিয়ে ব্যারিষ্টার চাটার্জি বড়লাটের কাছে আপীল করায় আমার মেয়াদ ছয়মাস কমে গিয়েছে। অস্ত্র আইনে দণ্ডের মূল মেয়াদ চার বছরের মধ্যে তিন মাস working remission আর চার মাস যুদ্ধ-শান্তি রেমিশন পাওয়ায়—আমার মূল মেয়াদ অতীত হয়েছে কয়েক দিন আগেই।

ওয়ার্ডে ফিরে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলাম। মুক্তির আনন্দ আর বিদায়ের বেদনা যুগপৎ অনুভব করলাম। মুক্তি পেলাম। দাদা এনেছিলেন একখানা ধুতি, একটা খাকীর সার্ট আর এক জোড়া স্যাণ্ডেল। তাই পরে দাদা আর অপরিচিত তিন বন্ধুর সাথে জেল গেট থেকে রওনা হলাম একটা ট্যাক্সিতে।

গাড়ীর পেছনের সীটে অপরিচিত ভদ্রলোক দাদা, আর আমি। দাদা জানালেন টেকো মাথা ভদ্রলোক পুলিন দাস।

পুলিন দাস? ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা—বিপ্লবীনায়ক—

বিখ্যাত লাঠিয়াল পুলিন দাস। বিস্ময়ে আমার চোখ দুটী নির্নিমেষ হয়ে গেল—সর্বাঙ্গ হল রোমাঞ্চিত। গাড়ী এসে থামল কলেজষ্ট্রীট মার্কেটে,—একটা সাবানের দোকানে। পুলিন বাবুর দোকান। এখানে আরও বহু বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। অনুশীলনের অপরাপর নায়ক শ্রীপ্রতুল গাঙ্গুলী, শ্রীরমেশ আচার্য্য শ্রীরবি সেন, শ্রীআশুতোষ কাহালী ও শ্রীবীরেন চ্যাটার্জি প্রভৃতির সাথে পরিচয় হল এখানে। ভিড় লেগে আছে সর্বদাই।

বেলা এগারোটায় পুলিন বাবু আমাকে হাইকোর্টে নিয়ে গেলেন। প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার বি, সি, চাটুয্যেকে দেখলাম। তিনিই আমাকে সাথে নিয়ে, সব ব্যারিষ্টারদের কাছে গেলেন। সকলের নাম মনে নাই। তবে শ্রদ্ধেয় এ, চৌধুরী আর এস, এন, হালদারের সস্নেহ সম্ভাষণ আজও মনে আছে।

দাদার সাথে রসারোডে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ী গেলাম। মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন। দর্শন পেলাম তাঁর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এই প্রথম দেখলাম। স্বর্গত সত্যেন্দ্র মিত্র আর হেমন্ত সরকার মহাশয়ের সাথে দাদা পরিচয় করে দিলেন।

দুই তিনদিন পর রওনা হলাম রাজসাহী। আমার জন্ম ও কর্মভূমি রাজসাহী। তখনও কলিকাতার সাথে রাজসাহীর রেলপথে যোগাযোগ হয়নি। লালগোলা ঘাট পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে—সেখান থেকে ষ্টীমারে যেতে হয়।

বেলা দশটায় রাজসাহী আখ্ড়া ঘাটে ষ্টীমার ভিড়ল। সাথে সাথেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে উঠল সমবেত ধ্বনি—বন্দেমাতরম্—আল্লাহো আকবর। নিশান, মালা নিয়ে রাজসাহীর চার পাঁচশো দেশকর্মী উপস্থিত ষ্টীমার ঘাটে। ব্যাপার কি? এতঘটা কিসের? কোন দেশবরেণ্য নেতা এসেছেন নাকি ষ্টীমারে? মনে কৌতূহল

নিয়ে ষ্টীমারের সিঁড়ি অতিক্রম করে যেই পা দিয়েছি মাটীতে অমনি আর এক পশলা ধ্বনি বর্ষণ ও আমাকে প্রায় অর্ধমর্দন। পরিচিত অপরিচিত বন্ধুরা হুড়াহুড়ি করে আমার দিকে এগিয়ে এসে মালার পর মালা দিলেন আমাব গলায়। আমার অবস্থা কহতব্য নয়—যাকে বলে একেবারে non-plussed. গুপ্ত বিপ্লবী দলের কর্মী, কাজ করি গোপনে, চলি ফিবি গোপনে,—এড়িয়ে চলি জটলা, এড়িয়ে চলি জনতা। দেশের লোক কেউ বলে দেবতা, কেউ বলে খুনী ডাকাত। কিন্তু প্রায় সকলেই মুখ ফিরিয়ে নেয় কাছে গেলে। অতি পরিচিত ও প্রিয় বন্ধুরাও দেখামাত্র দূর থেকে কেটে পড়েছে—আত্মীয় স্বজন সরকাবী পীড়নের ভয়ে ঘরের দোর বন্ধ করেছেন আমাদেব দর্শনে। এই তো স্বাভাবিক। এই অবস্থা মেনে নিয়েই তো এগিযে চলেছি বিপ্লবী সাধনাব গোপন পথে। মন যেখানে ধাক্কা খেয়েছে, সামলে নিয়েছি আঁকড়ে ধরে বিশ্বকবিব বানী—"ও তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তা' বলে ভাবনা করা চলবেনা।"

সেই আমাব অভ্যর্থনা—রাশি রাশি ফুলের মালা, প্রচুব পতাকা, শোভাযাত্রা আর সঙ্গীত দিয়ে! এ যে কল্পনারও বাহিরে!

বিমূঢ়ের মত শোভাযাত্রার সাথে চলেছি, লজ্জার ভারে দৃষ্টি ঝুঁকেছে পথের উপর, মাঝে মাঝে হচ্ছে পুষ্পবৃষ্টি—আমি দেখছি—ইট, খোয়া, সুড়কী আর পাথর।

শোভাযাত্রা কংগ্রেস অফিসে এসে থামল। আমিও আত্মগোপনের আশ্রয় পেয়ে বাঁচলাম।

—:•:—

ছয়

ফুস্-মন্তরের বদলে বক্তৃতামঞ্চ, দৃষ্টি এড়ানোর বদলে দৃষ্টি আকর্ষণ, জনান্তিকের বদলে জনারণ্যে! প্রচণ্ড ব্যবধান। কিন্তু দাদা বেশ মানিয়ে নিয়েছেন দেখছি। সারাদেশ যুড়ে মুক্তি-আবেগের খৈ ফুটছে চড়্‌বড়্ করে। অহিংস অসহযোগ আশ্রয় করে গণচিত্তের দীর্ঘ দিনের রুদ্ধ আবেগ আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজসাহীতেও এসেছে জোয়ার। এর পুরোভাগে ছিলেন আমার অগ্রজ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী। গণ-আন্দোলন গঠন আর পরিচালনে দাদার একটা বিশেষ যোগ্যতা আছে—যা' আমাদের অনেকের মধ্যেই নাই। মনে হ'ল দাদা তাঁর কাজের প্রকৃত ক্ষেত্র খুজে পেয়েছেন। তাঁর মত আবেগপ্রবণ লোকের পক্ষে বিপ্লবের গোপন পথ ঠিক উপযোগী ছিল না। নিষ্ঠা, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর দেশসেবার আগ্রহের জোরেই তিনি অনেক দূর এগিয়েছেন এ পথে। তবু তাঁর কর্মশক্তি "কুঁড়ির ভিতরের গন্ধের" মতই কাঁদছিল এতদিন। গণ-আন্দোলনের উতোল হাওয়ায় পাঁপড়িগুলি গিয়েছে খুলে, আসল মানুষটী বিকশিত হয়েছে শক্তির শতদলে। অসহযোগ আন্দোলনে দাদা নিজেও মেতেছিলেন, সারা জেলাটাকেও মাতিয়ে তুলেছিলেন।

আমার কিন্তু ওসব ভাল লাগত না। অহিংস-পথে স্বাধীনতার ঢক্কানিনাদ আমি ফক্কিকারী মনে করতাম। তাই দলের মত জানার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। চলে এলাম কোলকাতা। দেখলাম পুলিন বাবু অসহ-যোগের ঘোর বিরোধী। এক কথায় অসহ-যোগের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তিনি করে দিলেন—'চাপ দিয়ে চাওয়া'। শ্রীপ্রতুল গাঙ্গুলীর সাথে আলাপে বুঝলাম গণ-আন্দোলনের সাথে সাথে বৈপ্লবিক প্রস্তুতির পক্ষপাতী তাঁরা। শ্রীরমেশ আচার্য বললেন গণ অভ্যুত্থান

গণ্ডী মানবে না। হিংসার পথে যাবেই। কিন্তু সেদিনে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা যদি আমাদের না থাকে,—ব্যর্থ হবে অভ্যুত্থান—আন্দোলন পড়বে নুইযে। বেশ লাগল কথাগুলো। আমার উপর বিহার যাবার আদেশ হল। ভাগলপুরে গিয়ে ন্নন্টু, বুলু, জয়ন্ত, সচ্চিদা রাসবিহারী বাবু, কৈলাসবিহারী বাবু যোশী জি, কিশোরীবাবু প্রভৃতি সব পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করলাম। রাসবিহারী বাবু একজন নূতন কর্মীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাম যোগেন্দ্র স্নুকুল। পরবর্তীকালে বিহারের বিপ্লব আন্দোলনে শক্তিধর নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন ইনি।

পাটনা, মুংগের, মুজঃফরপুর সব ঘুরলাম। পুরানো বন্ধু প্রায় সকলের সাথেই দেখা করেছি। কিন্তু মনে হয়েছে অসহযোগের প্রবল আঘাতে বিপ্লব-বাদের ভিৎ নড়ে গিয়েছে। বাঙ্গালী বন্ধুরা আমাদের বক্তব্য বুঝল, বিহারী বন্ধুরা হাঁ ও না এর মাঝখানে মাথা নাড়ল।— আমি কোলকাতায় ফিরে রমেশদা'কে রিপোর্ট দিলাম।

ফিরে এলাম রাজসাহীতে। দাদা জেলার কংগ্রেস নেতা। আবার দলের ভারও তাঁর উপরই। কাজের বেজায় চাপ্। কোন দিকে সামলান তিনি। তাই দলের কর্মীদের দুটো ফ্রন্ট করা হয়েছে। কংগ্রেসের কাজে দাদার প্রধান সহকারী জেলের শিষ্য শ্রীপ্রফুল্ল রাহা, শ্রীতারেশ পঞ্চানন, আমাদের গ্রামের ভূপেন অধিকারী, সিরাজগঞ্জের শ্রীবীরেন মজুমদার, আমার পিসতুতো ভাই শ্রীঋতেশচন্দ্র তলাপাত্র, রাজসাহীর শ্রীপ্রফুল্ল বাগচী, শ্রীধীরেন গোস্বামী আর ৺তারানাথ রায়,— আমাদের তারাদা। আরও বহু কর্মী ছিলেন—যাঁরা মহাত্মার আহ্বানে জীবনের সব সম্ভাবনা ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। গোপন দল গঠনে দাদার প্রধান সহকারী ছিল মণি মিত্র আর তারাদাস। পড়াশোনায় ভাল ভাল ছাত্রেরা জুটেছে মণি

মিত্রের চার পাশে, আর তারাদাসের দল ভারী করেছে সুস্থ, সবল, মিলিটারী মেজাজের ছেলেরা। মনির সহকারীদের মধ্যে শ্রীসুবিমল সরকার শ্রীঅম্বিকা মৈত্র, শ্রীনির্মল রায়, ৺বিমল চক্রবর্তী, সুধাংশু ওরফে টুনু মুখার্জি, টুনী ব্যানার্জি প্রভৃতি দল গঠন ও পরিচালনে বহু যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তারাদাসের সহকারীদের মধ্যে শ্রীসুধাংশু ওরফে চেরু চৌধুরী, তার ভাই হিমাংশু ওরফে তাতা শ্রীজ্ঞানাঞ্জন লাহিড়ী; সত্য চৌধুরী, শ্রীনরেন দাস,—পরবর্তী যুগে—প্রভাত রায় ভোলা সরকার—ভোলা রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আমার বন্ধু জ্যোতীশ সরকারও সংগঠক হিসাবে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনেক কটি ছেলে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দলে আসে। নৃপেন রায়, বঙ্কিম দত্ত, তাঁদের অন্যতম। দাদার কংগ্রেসী সহকারীদের মধ্যে ভূপেন আর তারেশ পঞ্চানন গোপন দলের সভ্য সংগ্রহেও ওস্তাদ ছিল। একাধিক স্থানে গোড়াপত্তন ক'রে দলের পরিধি বাড়িয়েছে এরা দু'জন।

কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থাটা বুঝে নিলাম। এবার আমিও নামলাম আসরে। শুধু রাজসাহী শহর নয়—সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসাম ঘুরে গুছিয়ে নিতে হবে দলকে। রাজসাহীর কাজে আমার মস্ত সহায় ছিল শ্রীসরোজ গাঙ্গুলী—অধুনা ইম্পিরিয়াল টুবাকো কোম্পানীর ডিপো-ম্যানেজার! সরোজের মারফত আমি বহু ছেলের সাথে পরিচিত হই—যারা পরবর্তী কালে দলের সম্পদরূপে গণ্য হয়েছে। এদের মধ্যে শ্রীবীরেশ চক্রবর্তী ওরফে বীরু মামা, শ্রীসঞ্জীব ভট্টাচার্য্য ওরফে ভোলা শ্রীত্রৈলক্য সেনগুপ্ত, শ্রীনলিনী চৌধুরী—, শ্রীবিরজা বোস ও শ্রীযোগেশ চাকীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বীরু ছিল গোপন দলের টাইপ কর্মী। বিরজা পরবর্তী কালে নেতা হবার বহু যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

আমার আর এক আড্ডাখানা ছিল নলিনী স্মৃতি পাঠাগার—মুর্শিদাবাদের শহীদ নলিনী বাগচীর স্মৃতি তর্পণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত। স্কুল ও কলেজের কাছেই ছিল আমার 'স্বরাজ-ভাণ্ডার'—মূলতঃ খদ্দরের দোকান। তারই একপাশে লাইব্রেরী। স্কুল কলেজের ভাল ভাল ছেলেরা বই নিতে আসত আমার কাছে। এই সুযোগ নিয়ে আমি তাদের মাঝে বিপ্লবের বীজ বপনের চেষ্টা করতাম। এদের মাঝে শ্রীআদ্যনাথ কর্মকার, অধ্যাপক সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র রণেন, অধ্যাপক হেম গাঙ্গুলীর ভাই—বীরেন আর হরিপদ, অধ্যাপক রামপদ মজুমদারের—ভাগনে শীতাংশু সরকার—আর আজিকার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অন্যতম অধিকর্তা শ্রীউপানন্দ মুখার্জির নাম উল্লেখযোগ্য। রণেন ওরফে শিঙ্গা আজ ইঞ্জিনীয়ার, বীরেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বড় চাকুরে—আর শীতাংশু আমাদের গ্রেপ্তারের পর ডাঃ নারায়ণ রায়ের দলে যোগদান করে ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় এপ্রুভার হয়ে—অপার নামের অধিকারী হয়েছে। তবু রাজসাহীর শীতাংশুকে ভোলা যায় না। অদম্য উৎসাহ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ নিয়ে শীতাংশু ছিল কর্মী মহলে প্রেরণার উৎস। আমার মনে হয় কার্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতেও সে পিছপাও হ'ত না। কিন্তু জেলের সেল তার নির্জনতা ও নিশ্চলতার আঘাতে ভেঙ্গে ফেলেছে শীতাংশুকে। আর দলের নেতাদের স্বীকারোক্তি তার মনে জাগিয়েচে অন্ধ প্রতিহিংসা স্পৃহা। জানিনা আমার এই বিশ্লেষণ ঠিক কিনা!

সঞ্জীব, আদ্যনাথ কর্মকার আর ত্রৈলক্যর উৎসাহ ও কর্মশক্তি ছিল অসাধারণ। সঞ্জীব ছিল শহীদ প্রবোধ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাকে নিয়ে আমি জেলার বহুস্থানে ঘুরে দলের শাখা বিস্তার করেছি। ত্রৈলক্য সংগঠক হিসাবে বিশেষ দক্ষ ছিল। তারই মাধ্যমে আমি পেয়েছি বিজন সেন ওরফে চুনুকে, অনিল বটব্যাল, মনি সেন আর

মনি সরকারকে। চুনু আর ইহজগতে নাই। দেশ বিভাগের পর—কমুনিষ্ট কর্মী হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে রাজসাহী জেলে অবস্থানকালে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে সে জেল কর্তৃপক্ষের বর্বর আক্রমণে। বুদ্ধি, বিবেচনা উৎসাহ ও সংগঠন পটুতায় আত্মনাথ কর্মকার ছিল সবার সেরা। তাই অতি দ্রুত সে তরুণ দলের অধিনায়কত্বে পৌঁছুতে পেরেছিল। সে যে সব কর্মীদের দলে এনেছে তাদের মধ্যে শ্রীকালীদাস চক্রবর্তী, শ্রীবীরেন সরকার, শ্রীবরদা মুকুটমনি প্রভৃতি পরবর্তী কালে দলের অফুরন্ত শক্তির উৎস হয়েছিল। বরদা আজ ভারতের বলসেভিক পার্টির অন্যতম্ প্রধান নেতা। বীরেন রাজসাহীর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এডভোকেট আর কালীদাস আজও দেহে-মনে আগের মানুষটাই আছে। তবে সংসারের বেড়া-জালে তার দেশ সেবার আগ্রহ মর্মান্তিক ভাবে অবরুদ্ধ।

এই সময়ই আমার সাথে পরিচিত হয়—ক্ষিতীশ দেব। বিনয়ী, জ্ঞানপিপাসু, উদারহৃদয় ও দৃঢপ্রতিজ্ঞ ক্ষিতীশের মধ্যে আমি বিপুল সম্ভাবনার অঙ্কুর দেখতে পাই। আমার সে আশা ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে ক্ষিতীশ উত্তরবঙ্গে বিপ্লবী দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়করূপে গণ্য হয়। আজও সে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদলের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

রাজসাহীর কথা ঢের বলেছি। আরও বলতে হবে পরে। সুতরাং এখন থাক্। এইবার বেরিয়ে পড়ি জেলার বাহিরে।

দাদার নির্দেশ মত উত্তরবঙ্গ ও আসাম সফরে বের হলাম। প্রথমেই গেলাম বগুড়ায়। ছোট্ট সহর। স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন রায়,—আমাদের চিরপরিচিত যতীনদা আর শ্রীযুক্ত সুরেশ দাশগুপ্তের অসীম প্রভাব এই জেলায়। কংগ্রেসের সাথে সাথে যতীনদা জন-সেবার (Social service) আদর্শে স্থাপন করেছেন তাঁর "গণ-মঙ্গল।"

বহু গ্রামে এর শাখা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এর সভ্য। এক কথায় বগুড়ায় যতীনদা ছিলেন দশের ঠাকুর।

এহেন স্থানে ছোবল মারতে হবে—করতে হবে দলের শাখা স্থাপন। কঠিন কাজ।

আমি সিধে যতীনদার বাসায় গিয়ে উঠলাম। যতীনদা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশ্ন—কি উদ্দেশ্যে আগমন? বিবৃত করলাম মহৎ উদ্দেশ্য। যতীনদা বল্লেন "লুকোচুরি চলবে না। আমি এখানকার কর্মীদের হাজির করছি তোমার সামনে। তোমার কথা তুমি বল,—আমি বলি আমার। যারা যেতে চায় তোমার পথে—কোন বাধা দেব না।" আপত্তি জানালাম। বিনীতভাবে বললাম "হাটে বিপ্লববাদ-প্রচারের দিন আজও আসেনি যতীনদা।"

যতীনদা শুনলেন না। কংগ্রেস অফিসে আলোচনা সভা বসল। আমি আমার কথা জোরের সঙ্গেই বললাম। জানালাম--"এই গণ-অভ্যুত্থানে বিপ্লবীদের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী। কারণ কংগ্রেসী নেতারা এই বিরাট জাগরণ গণ-বিপ্লবে রূপায়িত করবে না—করতে পারে না। এই সময় বিপ্লবীরা যদি থাকে পেছিয়ে,—অক্ষম হয় বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দিতে—মিথ্যা হবে জাগরণ। ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। তাই দেশব্যাপী বিপ্লবী সংগঠন চাই।"

সত্যিই আমরা অক্ষম হয়েছি। জোয়ার এসেছে বারে বারে,—আমাদের অযোগ্যতায় বিফল হয়ে গিয়েছে ফিরে। তাই ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করেনি। ব্যর্থতার লজ্জায় আজ আমরা নতশির। আমাদের অক্ষমতার ফলেই জাতি আজ স্বাধীন হয়েও স্বাধীনতার স্বাদ পেলনা, মুষ্টিমেয় স্বার্থসেবীর শোষণে অন্তর তার জর্জরিত। আমাদের ব্যর্থতাতেই জাতি যখন নিত্য নূতন সংকটের চাপে কুঁকিয়ে মরছে,

পূজনীয় নেতৃবৃন্দের উল্লম্ফন অগ্রগতি ব'লে প্রচারিত হচ্ছে—মুমূর্ষুর মাথায় আন্তর্জাতিক স্তুতির মুকুট চড়ছে।

যেদিন এই আলোচনা হল তার পরদিনই হরতাল। আমি সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন ঘাঁটী তদারক করে বেড়াতে লাগলাম। উদ্দেশ্য কর্মীদের মন জানা। বুঝলাম বিফল হইনি। ডাঃ জে, এম দাশগুপ্তের ছোট ভাই দেবব্রত, তার ভাইপো সুরেশ নামে একটী ছেলে আরও দুজন কর্মী আমাদের দলে ভিড়ল। বগুড়া থেকে গেলাম সেরপুরে—সেখান থেকে রংপুর ও কুড়িগ্রামে। কুড়িগ্রামে শ্রীবীরেন দাশগুপ্ত আর সুশীল দেবের নেতৃত্বে আমাদের দল বেশ সুসংহত। নরেশ রায় এখানকারই কর্মী। আমি যেদিন আলিপুর জেল থেকে মুক্ত হই—পুলিনবাবু আর দাদার সাথে যে দুইজন কর্মী ছিল তার একজন নরেশ রায়—অপর জন তারেশ পঞ্চানন।

বীরেন আর সুশীলকে সাথে নিযে এলাম রংপুরে। এখানে দেখা হল শ্রীরমেশ আচার্যের সাথে। রমেশদা আর আমি এরপর গাইবান্ধা ও জলপাইগুড়ি গিয়েছি। জলপাইগুড়িতে কংগ্রেস অফিসে শ্রীখগেন দাসগুপ্তের সাথে আলাপ করতে গিয়ে জানলাম মাদারীপুরের বীরবালক নৃপেন্দ্রনাথ এসেছেন। সাথে আছেন শ্রীবামনবাস চক্রবর্তী। বিকেলে বক্তৃতা হল। বেশ বলে ছেলেটী।

রমেশদার কাছে সব জেলার কাজের খবর দিয়ে আমি রওনা হলাম আসামে। প্রথমে গেলাম গৌরীপুর আর ধুবড়ী। সেখানকার কাজ সেরে গৌহাটী রওনা হলাম। গৌহাটীতে ট্রেণ থেকে নেমেই গেলাম সিধে স্বর্গত নেতা নবীন বরদলৈএর বাড়ী। সেখানে দেখি অসংখ্য লাল পাগড়া। একজন খদ্দর পরিহিত লোকের হাতে দাদার চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলাম বরদলৈএর কাছে। তিনি বাহিরে এসে আমার সাথে দেখা করলেন। বললেন অন্য সময় আসতে। সেখান

থেকে গেলাম স্বর্গত নেতা তরুণ ফুকনের বাড়ী। সেখানেও লালপাগড়ী। ব্যর্থ হয়ে গৌহাটী থেকে গেলাম লামডিং। সেখানে দুই তিনজন বাঙ্গালী রেলকর্মী সভ্য ছিলেন। তাঁরা কিছু টাকা দিলেন। হিল-সেক্সন দিয়ে এলাম আখাউরা। এখানে রাজসাহী কলেজের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা জিতেন নন্দীর বাড়ী। আখাউরাতে জিতেনবাবু ছোটখাট একটা দল গড়ে তুলেছেন। তিন চার জনের সাথে পরিচিত হলাম। দুইদিন পর বিদায় নিয়ে পাড়ি দিলাম রাজসাহীতে।

কিছুদিন পরই শারদীয়া পুজো। কুমিল্লা থেকে বগলা বার বার লিখছে যাবার জন্য। অবশেষে টাকাও পাঠালো যাবার খরচ হিসাবে। রওনা হলাম কুমিল্লায়। উঠলাম গিয়ে সোনারং কম্পাউণ্ডে শ্রীসুরেন রায়দের বাড়ী। শ্রীঅতীন রায়ও থাকতেন এই বাসায়। শ্রীযোগেশ চাটার্জির বাসাও এই পাড়াতেই। অতীনদা ভট্টাচার্য ভ্রাতৃদ্বয়, অমূল্য মুখার্জী, মনীন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আলোচনা চলে দিনের পর দিন। এই সময়ই বুঝতে পারি অতীনদার মনে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ দানা বেঁধেছে। তিনি যখন আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন মুদ্রার মাধ্যম চলে যাবে, সরাসরি বিনিময় দেখা দিবে তখন হেসে বলেছিলাম হাওয়ায় দাঁড়িপাল্লা ঝুলবে। তবু এটা ঠিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থনে আমাদের দলের যে কয়টী নেতা ও বিশিষ্ট কর্মী এগিয়ে এসেছেন অতীনদা তাঁদের অন্যতম।

তিন চারদিন পর গ্রামের বাড়ী কাশীনগর থেকে বগলা এসে হাজির হল। তার সাথে চলে গেলাম কাশীনগর।

বগলাদের বাড়ীর অনেকেই বিপ্লবীদলের সভ্য ছিলেন। নামকরা দেশ নেতা ৺বসন্ত মজুমদার ও তাঁর সুযোগ্যা পত্নী শ্রদ্ধেয়া হেমপ্রভা মজুমদার বগলাদের সরিক। ঢাকার কলতাবাজারের শহীদ বিপ্লবী

নায়ক তারিণী মজুমদার ওরফে ষ্টারও বগলাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। বগলার দাদা কালীবাবুও দলের সক্রিয় সভ্য। বেশ হৈ চৈ করে কেটে গেল পুজোর ক'দিন। এখানেই আমি বিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গত শৈলেন চৌধুরীকে প্রথম দেখি। আজকের নামকরা পরিচালক সুশীল মজুমদার তখন ছোট্ট ছেলে।

পূজা অন্তে কাশীনগর থেকে কুমিল্লা—তারপর রাজসাহী। এদিকে অসহযোগের বিরাট গণ-আন্দোলন ঝিমিয়ে এসেছে। উত্তরবঙ্গের বন্যায় রিলিফের কাজে দাদা চলে গিয়েছেন আত্রাই অঞ্চলে। আমি তারেশ বাবুকে সাথে নিয়ে গেলাম বালুরঘাটে। সেখানকার দল গঠনে তারেশ বাবু যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরই মাধ্যমে পরিচিত হলাম দলের সভ্যদের সাথে। শ্রীকালী নারায়ণ সান্যাল, দ্বিজেন দাস, হরিপদ বসু মণি চক্রবর্তী আর টগরের কথা আজও মনে আছে। এরা সকলেই উৎসাহী কর্মী। সাঁওতাল গুরু শ্রদ্ধেয় কাশীশ্বর চক্রবর্তীর সাথে দেখা করলাম। আদিবাসীদের উপর অমিত প্রভাব তাঁর। অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ার দিকে তিনি জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন।

তারেশবাবুর আর একটা মস্ত গুণ—মা, মাসী, দিদি পাতিয়ে মেয়ে-মহলে তিনি চট করে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। জিনিষপত্র রাখার —ফেরারী পোষার, মাঝে মাঝে টাকা পয়সারও বেশ সুবিধা হয় এতে।

বালুরঘাট থেকে গেলাম দিনাজপুর। বালুবাড়ী মহল্লায় শ্রীবীরেন গুহের সাথে দেখা করে কাজ কর্মের আলোচনা সেরে পাড়ি দিলাম রাজসাহী।

কিছুদিনের মধ্যেই দলের বড়কর্তাদের নির্দেশমত শ্রীসুরেশচন্দ্র ভরদ্বাজ ওরফে পালোয়ান রাজসাহী এসে উত্তরবঙ্গের ভার বুঝে নিলেন। আমার ডাক পড়ল ঢাকায়।

ঢাকায় এসে বহু নামকরা কর্মীর সাথে দেখা হল। নলিনী ঘোষ ওরফে রাজেন বাবুর সাথে আবার দেখা। আমাদের শ্রীত্রৈলক্য চক্রবর্তী ওরফে মহারাজ, শ্রীমদন ভৌমিক শ্রীরমেশ চৌধুরী—সকলেই জেল থেকে বাহিরে এসেছেন। দলের প্রধান নেতা শ্রীনরেন সেন, নৈষ্ঠিক বিপ্লবী শ্রীআশুতোষ কাহালী, শ্রীতরণী সোম, শ্রীগোবিন্দ কর, শ্রীসুবোধ নাগ প্রভৃতি সকলের সাথেই পরিচয় হল। খুবই আনন্দ হল শ্রীতারাপ্রসন্ন দে ওরফে টিপু সুলতানকে দেখে। প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁর দেয়া ঝাঁটা কাঠির চিরুণী ফেরত দিতে পারছি না বলে দুঃখ প্রকাশ করলাম তাঁর কাছে। তারা বাবু হেসেই খুন।

ঢাকার Budding leaders অর্থাৎ উদীয়মান নেতাদের সাথেও পরিচয় হল। শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত—তরণীদা'র দেয়া স্নেহ-মধুর নাম—পুনা চোরা, শ্রীনলিনী দত্ত সুধীর বসু, ৺হরিশ সরকার (যিনি এককালে বাংলার ব্যাঙ্ক মহলে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন), ৺অসিত ভট্টাচার্য, ৺ধনেশ ভট্টাচার্য, গুরু গোবিন্দ, শচীন চক্রবর্তী, হীরেন মজুমদার ওরফে ঝুনু, গোপাল বসাক, নলিন্দ্র সেন, রমেশ দাস, আশু রায়, সরল সেন, অধীর মুখার্জী আরও বহু বিশিষ্ট কর্মীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলাম। এখানে কিন্তু দলাদলির তীব্রতা বড় বেশী মনে হল। বিভিন্ন দলের মধ্যে মুচের মত পথে ঘাটে মারামারি হয়। আর তা অতি সামান্য কারণে। আরও মজার কথা, এই মারামারির সাফল্য নিয়ে দলের মধ্যে আস্ফালন চলে! এই বাড়াবাড়িতে নাকি দল বাড়ে তাড়াতাড়ি। প্রায় বর্বর যুগের সামিল!

একদিন এমনি মারামারিতে Edward, the Peacemaker এর ভূমিকা নিতে গিয়েছিলাম মাঝে পড়ে। একটা ঘুষির বোমা ফাটল মুখের উপরে,—রক্ত বেরুল দর্‌দর্‌ করে। আমাদের দলের নলিনী দত্ত, জগদীশ, অধীর, হরিশ সরকার এর প্রতিশোধ নিলেন অপর দলের—

শ্রীসংঘের একজনের ঝাঁকড়া চুল ধরে আর ঘুষি বর্ষণ করে। পরে জেনেছি এই ঝাঁকড়া চুল ব্যক্তিটী হচ্ছেন সত্য গুপ্ত—আজের ।ব. ভির নেতা মেজর সত্যগুপ্ত।

প্রতুলদা'র কাছে এই পথ-সংগ্রামের প্রতিবাদ জানালাম। তিনি বললেন—"সত্যিই এটা ভাল না। বন্ধ করা উচিত।"

উচিত তো হয় না কেন? প্রতুলদা দলের নেতা। তিনি ইচ্ছা করলেই তো এই মূর্খ মাবামারীর মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন!

তখন বুঝিনি। আজ বুঝি আমাদের পণ্ডিতজীব মত দেশবরেণ্য নেতা হবার কিছু কিছু যোগ্যতা প্রতুলদার মাঝে ছিল। উদার কথা আর অসার কাজের "সহ-অবস্থান' নীতি ভীতিজনক ভাবে বাসা বেঁধেছে এদের চরিত্রে। ব্যস্-থামা যাক্। আর এগুলে চারদিক হতে উপদেশ আসবে—নিন্দাং ত্যক্ত্বা ভবত ভক্তাঃ।

দু'তিন সপ্তাহ পরই শ্রীযুত নরেন সেন আমাকে বললেন—'চল'। বিনা বাক্য ব্যয়ে তার সাথে চললাম। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ—সেখান থেকে ষ্টীমার যোগে ফরিদপুরের টেপাখোলা ঘাট। ষ্টীমারের উপরই নরেনদা বুঝিয়ে দিলেন ফরিদপুরে আমাদের পাঁচসাত জন সভ্য আছেন। কিন্তু তাঁরা কিছুই করেন না—আর বাহির থেকে এসে ফরিদপুরে কেউ কিছু করুক,—সেটাও চান না। এই অবস্থার মাঝে আমাকে দল গুছাতে হবে সেখানে। ব্যাপার গুরুচরণ! অথচ সম্বল আছে নরেন-দার আশীর্বচন—'তুমি পারবা।'

নরেনদা'র সাথে গিয়ে উঠলাম দলের গৃহী সভ্য শ্রীরমেশ দাশগুপ্তের তাঁতের কারখানায়। নরেনদা শ্রীঅমিয় রায়, শ্রীসুরেশ রায়, শ্রীপ্রমথ সরকার আর শ্রীনিবারণ পালের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কয়েক দিন মিশেই বুঝলাম এঁরা কেউ কাজ করেন না। তবে প্রমথবাবু আর সুরেশবাবু দলের শক্তিবৃদ্ধি কামনা করেন।

ছয় সাত মাসের চেষ্টায় ফরিদপুর সদর ও গোয়ালন্দ মহকুমায় প্রায় শতাধিক যুবক দলে এল। সকলের নাম আজ আমার মনে নাই। তবে দলের শক্তি সংগ্রহে যে সকল ছাত্র ও যুবক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের মধ্যে অমিয় বাবুর ছোট ভাই শ্রীফণীন্দ্র রায়, শ্রীসত্য সেন ওরফে ভোলা, শ্রীবিজলী দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রমোদ সেন, শ্রীআশু রায় শ্রীনলিনী ঘোষ নামে একটী যুবকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরেশ বাবু আর প্রমথবাবুও বহুভাবে সহায়তা করেছেন আমার কাজে।

ফরিদপুর থাকা কালেই আমি যুগান্তর দলের শ্রীপ্রমথনাথ গুহের সহিত পরিচিত হই। ফরিদপুর সদরে এঁদের গোপন গতিবিধি বড় একটা ছিল না। তবে কংগ্রেসের মোড়ল এঁরাই ছিলেন।

ফরিদপুর জেলাতেই পালং—বিলাসখানে শ্রীজীবনকুমার ঠাকুরতা ওরফে লেংড়ু, ওরফে থিব, শ্রীআশুতোষ কাহিলী শ্রীরাইচরণ সেন, শ্রীহারাণ রক্ষিত প্রভৃতি দলের বিশিষ্ট সভ্যদের বাড়ী। অসহযোগ আন্দোলনের সুরুতেই তাঁরা স্বগ্রাম বিলাসখানে একটী জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁতের কারখানাও খোলা হয়েছে সেখানে। বহুদিন থেকেই সেখানে যাবার ইচ্ছা ছিল আমার। হঠাৎ সুযোগ মিলে গেল। খবর পেলাম জীবনদা'র বিয়ে। আহ্বানও এল তাঁর তরফ থেকে। গেলাম বিলাসখান। পরিচিত হলাম জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে। জীবনদার বাড়ীতে একদল কর্মী আমাকে ঘিরে আছে। জীবনদার দিদি বার বার আদেশ করছেন—জামা খোলো—নাওয়া খাওয়া সেরে নাও। আমি একথা ওকথা বলে কালহরণ করছি। জীবনদা ওস্তাদ লোক। সব বুঝে হেসে বল্লেন—লজ্জা কি। সবই আপনার লোক।

সত্যিই জামা খুলতে আমার বিষম লজ্জা হচ্ছিল। সামনে দশ বারো জন লোক। ইয়া ইয়া হোঁৎকা কোঁৎকা চেহারা! আর আমার

হাড় বেরুনো বুক জোড়া। ঐশ্বর্যের পাশাপাশি দীনতাকে তুলে ধরতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তবু জীবনদার কথায় কাষ্ঠ-হাসি হেসে কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যে বললাম—নাঃ—লজ্জা কিসের! অতঃপর আবরণ উন্মোচন ক'রে কঙ্কাল-প্রায় কায়াখানা তুলে ধরলাম দশের হাস্যকুঞ্চিত দৃষ্টির সামনে।

শ্রীরাইহরণ সেন, শ্রীহারাণ রক্ষিত, শ্রীসীতানাথ বাবু, শ্রীশচীন্দ্র করগুপ্ত—জীবনদার 'শোচ্যার' সাথে পরিচিত হলাম। কিন্তু সব চেয়ে বড় পরিচয় পেলাম জীবনদা'র দিদির। বহু বিপদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে—তিনি ভাইদের দলের কাজে এগিয়ে এসেছেন।

দিদির পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করেছি।

ফিরে এলাম ফরিদপুরে। কিছুদিন পরই সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স। দলবল নিয়ে হাজির হলাম সেখানে। নরেন দা, আশু দা, সুরেশ ভরদ্বাজ প্রভৃতি দলপতিরা আগেই হাজির হয়েছেন। নরেনদা—ফেরারী। কয়েক মাস আগেই তাঁর নামে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী হয়েছে। তাঁকে রাখা হয়েছে সিরাজগঞ্জের শ্রীনরেন ভট্টাচার্যদের বাড়ীতে। আমরা সব আনাগোনা করি। আশুদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাথে ঝগড়া করে এলেন হিন্দু-মুস্লিম প্যাক্ট নিয়ে। আমাদের দল প্যাক্টের পক্ষে নয়। আমাদের ধারণা ছিল প্যাক্ট দ্বিজাতি-তত্ত্বের পরোক্ষ স্বীকৃতি। তাই আমরা ঘোর বিরোধী।

সম্মেলন মণ্ডপে বসে আছি। হঠাৎ খবর এল নরেন ভট্টাচার্যের বাসা ঘেরাও করেছে পুলিশ। তবে নরেনদাকে সরানো হয়েছে সেখান থেকে।

সিরাজগঞ্জের কর্মীরা নরেনদাকে নিয়ে গিয়েছে লাহিড়ী মোহনপুরে। আমাকেও সেখানে যেতে হবে।

লাহিড়ী মোহনপুর আমাদের বড় ঘাঁটী। শ্রীঅমূল্য লাহিড়ী, তার ভাই অনাথ, শীমনীন্দ্র ওরফে জল্পেশ লাহিড়ী, আমাব বন্ধু সুধীর মজুমদার আরও কয়েকটী যুবক আমাদের দলের সভ্য। গ্রামটা দ্বীপের মত হয় বর্ষাকালে। সুতরাং সরে পড়ার খুব সুবিধে।

মোহনপুরে কাজ কর্মের আলোচনা অন্তে নরেনদাকে নিয়ে রাজসাহী গেলাম। সেখান থেকে আমি পাড়ি দিলাম ফরিদপুরে—নরেনদা বোধ হয় মৈমনসিংহ হয়ে—পদব্রজে ঢাকায়।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার জরুরী ডাক এল ঢাকা থেকে। তৎক্ষণাৎ যেতে হবে সেখানে। গেলাম। গিয়ে দেখি সব লণ্ডভণ্ড। দলে বিদ্রোহ ঘটেছে—শ্রীসতীশ পাকড়াশীর নেতৃত্বে। নলিনী দত্ত, সুধীর বসু প্রভৃতি শক্তিশালী তরুণ নেতারা বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছেন,—বিদেশাগত বোমা-বিশেষজ্ঞ নলিনী গুপ্তও তাঁদের সাথে। অবস্থা বুঝে রুশ প্রত্যাগত বিপ্লবী-প্রধান অবনী মুখার্জিকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে ঢাকা থেকে। পরে আশুদা সুভাষ বাবুর সাহায্যে তাঁর ভারত ত্যাগের ব্যবস্থা করেছেন।

নরেন দা আর প্রতুল দা ঢাকার ভার নিতে বললেন আমাকে। জিলার বিপ্লবী সংস্থা বুঝে নিলাম ধীরে ধীরে। দল থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে গেছে বহু—আছেও বহু। যারা আছে তাদের মধ্যে শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত শ্রীশচীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৺অসিত ভট্টাচার্য্য, ৺হরিশ সরকার, ৺ধনেশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিন্দ্র সেন, শ্রীআশু রায়, ডাঃ রমেশ দাস, ডাঃ বিনয় সেনগুপ্ত, শ্রীবিনয় রায়, শ্রীনেত্র সেন, শ্রীশিশির সেন, শ্রীঅধীর ব্যানার্জি, শ্রীঅজিতানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীযোগেন্দ্র সেন, শ্রীভবানী সেন ডাঃ সরল সেন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দলের নারায়ণগঞ্জ শাখায় বিশেষ ভাঙ্গন ধরেনি। সেখানকার তরুণদের নেতা শ্রীব্রজেন দাস ও শ্রীসতীন্দ্র রায়ের আনুগত্য পুরো

পুরিই বজায় আছে। দলের পুরাতন কর্মী শ্রীসুবোধ নাগ, শ্রীতারাপ্রসন্ন দে, শ্রীতরণী সোম, শ্রীগোবিন্দ কর আর শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষের—সহযোগিতা ও উপদেশ সর্বদাই পেয়েছি আমি। সকলের সাহায্যে জেলার কাজকর্ম গুছিয়ে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি আমার।

এরই মধ্যে শ্রীত্রৈলক্য চক্রবর্তী—আমাদের মহারাজ—এসে হাজির হয়েছেন ঢাকায়। পূর্ণানন্দ আর আশু রায়কে নিয়ে তিনি নোট জালের কারখানা খুলে দিলেন। আমিও মাঝে মাঝে সাহায্য করতাম। নলিন্দ্র ওরফে পদ্মা আর ভবানীর সাহায্যে আমি ঢাকাতেও কিছু কিছু নোট চালিয়েছি। মহারাজ, পূর্ণানন্দ আর আমার গ্রেপ্তারের পরে—শ্রীনলিনী ঘোষের নির্দেশে ৺প্রবোধ দাশগুপ্ত আর বন্ধুবর শচীন্দ্র চক্রবর্তী এই কাজে হাত দেন এবং শেষে হাতে নাতে গ্রেপ্তার হন। বিষ্ণু শর্মা সত্যই বলেছেন— 'খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং

নুনং ফলতি সাধুষু—'

মহারাজের মহাপাপের ফল পেলেন বেচারা প্রবোধদা আর শচীন!

নোট-ছাপাই চলেছে পুরোদমে। ডাকাতির বিকল্প ব্যবস্থা জালিয়াতী! অথচ বাহিরে এঁরাই কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক আর সভাপতি!

প্রখ্যাত বিপ্লবী ৺শচীন সান্যাল এলেন একদিন। এক গোছা নোট নিয়ে চলে গেলেন কোলকাতায়। হঠাৎ খবর এল রাজবাড়ী ষ্টেশনে প্রতুলদা ধরা পড়েছেন।

মহারাজের নির্দেশে আমি ঢাকা শহর ছেড়ে বিক্রমপুরে রওনা হলাম। কয়েকটী গ্রামের কাজ সেরে হাজির হয়েছি জৈনসারে,—পূর্ণানন্দের মামা বিনোদিনী বাবুর বাড়ীতে। সেখানে খবর পেলাম ঢাকাতে ব্যাপক থানা-তল্লাসী হয়েছে। পূর্ণানন্দ—চট্টগ্রামের সারদা চক্রবর্তী, আরও বহু কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে। বিক্রমপুরের কাজ স্থগিত রেখে আমার অবিলম্বে ফিরতে হবে ঢাকায়। মহারাজ মৈমনসিংহে।

বিনয় রায়কে সাথে নিয়ে তালতলা থেকে নৌকাযোগে ঢাকায় এলাম। উঠি কোথায়? হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাজারদেউড়ীতে রাজসাহীর ৺ঋভু সরকারদের বাসা। সে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। সেখানে আশ্রয় মিলল। বাসায় তখন কেউ ছিল না। একা ঋভু। প্রায় তিন সপ্তাহ সেখানে থাকি। কিছুদিন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং হোষ্টেলে ছাত্র নেতা রাজসাহীর কুলদা সান্ন্যালের গেষ্ট হয়েও কাটিয়েছি। কুলদা সম্প্রতি টালা ব্রীজ Bus accident-এ মারা গিয়েছে। তার মাঝেই গোপাল বসাক তাদের মহল্লায় একটী বাসা ঠিক করে ফেলেছে। সেখানে যাবার কিছুদিন পরই ঢাকা বিভাগের পরিচালন-ভার পড়েছে আমার উপরে।

ইতিমধ্যে—বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারী হয়েছে। সুভাষ বাবু ৺সত্যেন্দ্র মিত্র শ্রীঅনিলবরণ রায় (বর্তমানে পণ্ডিচেরী আশ্রমে) প্রমুখ বহু নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। আমাদের দলেরও বহু বিশিষ্ট নেতা ও কর্মী অর্ডিনান্সে ও ১৮১৮ সালের তিন আইনে ধৃত হয়েছেন। দেশবন্ধু তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

ফরিদপুর থাকা কালেই পুলিশ আমার সন্ধানে ছিল। জিতেশ লাহিড়ী ভ্রমে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছিল রাজবাড়ীতে। এতেই আমাকে সতর্কতার নির্দেশ দেয়।

বরিশালের কাজ কর্মের গোছ গাছ প্রয়োজন। জামালপুরের কিরণ সেন সেখানকার চার্জে। তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে আনতে হবে। পুলিশের কড়া নজর তাঁর উপর।

আমি ফরিদপুর ছাড়ার পরই ফরিদপুরের ভার পড়েছে বরিশালের শ্রীনরেন দাসের উপর। ভয়ানক বুদ্ধিমান্ আর উৎসাহী।

নরেনের সাথেই বরিশাল গেলাম। শ্রীগোপাল মুখার্জি প্রমুখ পুরাতন বন্ধুদের সাথে দেখা হল। ভোলা থেকে শ্রীকৃষ্ণ ঘোষও এসে দেখা

করলেন। কঙ্কালসার এক ফোঁটা মানুষটী। মাথা দিয়ে তেল চুইয়ে পড়ছে—নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে। হাঁপানির রুগী। অথচ বুক জোড়া ত্যাগ আর নিষ্ঠা।

ঢাকা কলতাবাজার কেসের হরিচৈতন্য বাবু কিছু দিন পূর্বেই মুক্তি পেয়ে বরিশালে এসেছেন। তিনিও এসে আমার সাথে দেখা করলেন।

এইবার কাজকর্মের কথা। বরিশালে দলের শক্তি ভালই ছিল। কিরণ বাবু অনেকগুলি ব্যাচ্-লীডারের সাথে দেখা করিয়ে দিলেন; তাদের মধ্যে শ্রীধীরেশ রায়কে যোগ্যতম বলে আমাব মনে হল। কিরণ বাবু আর নরেনের সাথে আলোচনায় আমার ধারণা সমর্থন পেল। সুতরাং ধীরেশের উপরই বরিশালেব পরিচালন ভার দিবার সিদ্ধান্ত করা গেল।

বরিশালে থাকা কালেই খবরের কাগজে দেখলাম মহারাজ মৈমনসিংহে শ্রীবিনয় রায় চৌধুরীদের বাসায় ধরা পড়েছেন। বিনয়কেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশে।

ঢাকায় ফিরতে হল। তবে ফেরার পথে ফরিদপুর জিলার ইদিলপুরে নেমেছিলাম। সেখানে দলের একটী শাখা ছিল। একজন সন্ন্যাসীও সভ্য ছিলেন। কারও নাম মনে নাই। মনে না থাকার একটী মস্ত কারণ এই যে দলের কর্মীদের পরিচয় নামে ছিল না—ছিল ছদ্ম নামে আর যোগ্যতায়।

ঢাকায় ফিরে আসার পরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। আমার বাসায় ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত থাকে। আমি বড় একটা বাহিরে যাই না। নারায়ণগঞ্জের ব্রজেন্দ্র, সতীন্দ্র আর ঢাকার ৺ধনেশ ভট্টাচার্য, নলিন্দ্র সেন, অজিতানন্দ, শচীন, অধীর, ভবানী আর গোপালের সাথে মাঝে মাঝে দেখা করি, তাদেরই মাধ্যমে কাজকর্ম চালাই। ভবানীকে বিদেশে পাঠানো ঠিক হয়েছে। কয়েকটা মশার

পিস্তল আছে,—সেই রডার মাল। সেগুলিকে বাসায় এনে দেখেশুনে পান্নার জিম্মায় দিয়েছি। সব শৃংখলা মত চলছে। ধনেশ খুব খাটছে। খবর এসেছে কোলকাতা থেকে আশুদা আসবেন। দল আবার বিপর্যয়েব মুখোমুখী দাড়িয়েছে। মাথায় রাজ্যের ভাবনা। সেদিন রাত তিনটায় ঘুম ভেঙ্গেছে। বহু চেষ্টাতেও ঘুম আসে না। আইঢাই করছি মাদুবের উপর। মনে হল ছাদের উপব হনুমান লাফাচ্ছে। ভোর না হতেই এসে জুটেছে! হঠাৎ ঘরেব দোরে প্রচণ্ড ধাক্কা। 'খুলি' বলে বিনয় দৌড় দিল দোবের দিকে। আমিও খিডকী খুলে লাফিয়ে পডলাম পাশের বাড়ীতে। পুলিশেব ধাক্কা বুঝতে একটুও ভুল হয়নি। তিন বারেব দাগী চোর কিনা! এক বুড়ী জল তুলছিল—উঠল চেঁচিয়ে। মুহূর্ত মধ্যে পাঁচ-সাতটা টর্চের আলো পড়ল আমার মুখের উপরে। ছাদের উপর থেকে আওয়াজ এলো "হুঁসিয়ার"। উপরে চেয়ে দেখি পাঁচ-ছয় জন গুর্খা বন্দুক তাক্ কবছে আমার দিকে। ছাদের উপবে তবে হনুমান নয়,—একেবারে Eastern Frontier Rifles এর গুর্খা সেপাই! আমার অনুমান ভুল। এধারে চক্ষুর নিমেষে টর্চের মালিকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাব উপর। কে একজন বলল "This is Jitesh Lahiri'—ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হ্যাম্সন সাহেব বললেন "ব্যস্—লে চলো!"

সাত

অতএব চলিলাম। বিনয়কেও গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু তাকে আমার কাছে আনেনি। একটা বিবৃতি নিয়েই ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে প্রথমে আই, বি অফিস,—তারপর জেলে নিয়ে গেল। পূর্ণানন্দরা সাত-আটজন ঢাকা জেলেই একটা ওয়ার্ডে ছিল। আমাকে তাদের দিকেই নিলনা। অসাধারণ সম্মানী লোক কিনা! তার উপর

বিপ্লবের ধ্যান-ধারণায় সমাহিত জীবন। পাছে আমার ভাব-সমাধির বিঘ্ন ঘটে এই বিবেচনায়ই বোধহয় দুই পাশের আট দশটা সেল খালি করে মাঝের সেলে আমাকে স্থাপিত করা হল। সেলের সামনে পড়ল এক দোবিল্লা জমাদারের ডিউটী। আমি জেল ও পুলিশের আঁতাতের বিউটী দেখে মুগ্ধ হলাম। একটী মাস কর্তাদের কৃপায় বাধ্য হয়ে ধ্যানমগ্ন রইতে হল। লেখা বা পড়ার কোন সুযোগই না দিয়ে পচিয়ে মেরেছে আমাকে। যাক্—মাস পেরুলো—আমারও নির্জন কারাবাসের ম্যাদ্ ফুরুলো। বদলী হলাম হুগলী জেলে। এখানেও স্থান হল সেলে। তবে বন্ধু মিলল আরও চারজন। এর মাঝে একজন আমার পূর্বপরিচিত—ক্ষেত্রদা'র ছোট ভাই ৺সতীশ সিংহ। অপর বন্ধুদের একজন শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী—পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়করূপে যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

জেলে ঢুকেই জানলাম বন্ধুরা জেল কর্তৃপক্ষের সাথে লড়াই সুরু করে দিয়েছেন। বিনা বাক্যব্যয়ে আমিও যোদ্ধা শ্রেণীর সামিল হয়ে গেলাম। দত্তসার জেল-সুপার সকালে আমাদের সেলে এলেই আমরা তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসে থাকি;—বিকেলে জানতে পারি একটা সাজা বেড়েছে। অবশেষে বড় সাহেবের আচরণের প্রতিবাদ প্রায়োপ-বেশনে গিয়ে ঠেকল। তিন-চারদিন অনাহারে রইলাম আমরা। জেল ডাক্তার এসে বলেন—একি hunger-strike আপনাদের? হ্যাঁ—এই জেলেই hunger-strike করেছিলেন বটে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম। প্রথম দিনেই ভিরমি,—দ্বিতীয় দিনেই force-feeding,—অর্থাৎ মুখের কাছে দুধের বাটি ধরতেই এক নিঃশ্বাসে চোঁ চোঁ,—শেষ। কোনদিন আমার আসতে দেরী হলে অনুযোগ করতেন—"ডাক্তারবাবু! কি নিষ্ঠুর আপনারা! করবেন তো force-feeding!—তা'ও এত দেরীতে? কৈ আজ' কমলার রস

দেখছি নাতো! শুধু দুধ?—তার পরই গান—কারার এই লৌহ কপাট,—ভেঙে ফেল, কররে লোপাট .....

আপনারা একদম নিরামিষ মশাই,—শুষ্কং কাষ্ঠং—রস-কস নাই।"

যাক পঞ্চম দিনে বহরমপুর জেলে আমাদের বদলীর আদেশ এল। জেলার বাবু রসিয়ে বললেন "খেয়েই যান। চক্রবর্ত্তী মশাই আর লাহিড়ী মশাই বামুনের ছেলে। অভুক্ত গেলে গেরস্তের অকল্যাণ হবে।" বন্ধুবর অম্বিকাবাবু জেলারের দিকে যে ভাবে তাকালেন,—আমার আশীর্বাদের আবরণ না থাকলে বেচারা ভস্ম হয়ে যেত। খেয়েই গেলাম। দেবতারা অত্যাচারিত হয়েও অসুরদের বর দিয়েছেন এর ভুরি ভুরি নজির পুরাণে আছে।

বহরমপুর জেলের ভিতরে ঢুকতেই হৈ হৈ ব্যাপার। বন্ধুর দল সার্ বেঁধে এসে জেল গেটে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আনন্দের জোয়ারে দলাদলি তলিয়ে গিয়েছে। বিনা বিচারে আটক রাজবন্দী এই একটা মাত্র পরিচয়।

এখানে আমার পুরানো চেনা বন্ধুদের মাঝে পেলাম ৺ক্ষিতীশ ব্যানার্জি, শ্রীপ্রভাত চক্রবর্ত্তী, শ্রীতরনী সোম, শ্রীপূর্ণানন্দ, শ্রীনিবারণ পাল, শ্রীযোগেশ চ্যাটার্জি শ্রীঅমূল্য মুখার্জি, ৺অমূল্য অধিকারী, শ্রীপ্রতুল ভট্টাচার্য, শ্রীকালীপদ বাগচী আর শ্রীসুশীল ব্যানার্জিকে। সুভাষচন্দ্র আর অধ্যাপক অনিল বরণের সাথেও পরিচয় ছিল আমার—তবে শুধুই মুখচেনা। এই জেলেই আমাদের পরিচয় হৃদ্যতার স্তরে পৌছায়। আর যে সব বন্ধুদের সাথে নুতন পরিচিত হলাম তাদের মধ্যে ছিলেন মৈমনসিংহের ৺আনন্দ মজুমদার ও শ্রীশ্যামানন্দ সেন, মাদারীপুরের শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকালীপ্রসাদ ব্যানার্জী শ্রীকালীপদ রায়চৌধুরী, শ্রীসন্তোষ দত্ত, শ্রীবামন চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুরেন্দ্র সিংহ ও শ্রীসুরেন্দ্র সাহা পাবনার

শ্রীবামেন্দ্র দাস আব মধ্য কলিকাতার শ্রীনৃপেন্দ্র মজুমদার। সুভাষচন্দ্র আমাদের সাথে প্রায় মাস তিন ছিলেন। তাবপরই তাঁকে রেঙ্গুন নিযে গেল। বামন বাবু নিবারণ বাবু আর কালীপ্রসাদ বাবুও অল্পদিন পবেই জেল থেকে বাহিবে অন্তরীণ হলেন। আমাদের সভ্য সংখ্যা এই ভাবে কমে যাওযায আমরা প্রতিবাদ করব ভাবছি,—ঠিক এরই মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে এলেন রমেশদা (আচার্য) আব আশুদা (কাহিলী)। এঁবা আসাব পর থেকেই অনুশীলন সমিতির সভ্যদের কর্মচাঞ্চল্য বেড়ে গেল। জেল থেকে পালানোব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। শ্রীরমেশ আচার্য, শ্রীআশু কাহিলী, শ্রীযোগেশ চ্যাটার্জি, শ্রীপ্রতুল ভট্টাচার্য শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত আর, শ্রীজিতেশ লাহিড়ী জেলের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পলাযন করবে। বহরমপুরে তখন অনুশীলন সমিতির সংস্থা বেশ জোরদাব। শ্রীনিরঞ্জন সেন রয়েছে চার্জে। তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হল। বাহিব থেকে Steel Cutting Saw আর rope-ladder আনাব ব্যবস্থাও হল। স্থির হযেছিল বাহিরে গিযেই আমরা বিদেশে পাড়ি দেব। সেই উদ্দেশ্যে দু প্রস্ত করে সাহেবী স্যুট বানানো হল। আজও সে স্যুট আমাব বাক্সে পচছে। অনেকদূব এগিয়েছি আমবা। হঠাৎ একদিন খাবার ঘরে অনিল বাবু হেঁযালীব ভাষায বললেন—অনেক গোপন মতলবই সতর্কতার অভাবে ভেস্তে যায। সন্দেহ-প্রবণ মন আমাদের। খোজ নিয়ে দেখি সত্যই ভেস্তে গেছে আমাদের প্ল্যান। জেলের ভিতরে বাহিরে সতর্ক সশস্ত্র প্রহরী। এরই কিছুদিন পরে ডি আই, বি অফিসর আশুবাবুর দেহ গঙ্গার জলে ভাসল। সিভিল সার্জেন ডাঃ হাজরা একদিন অনিল বাবুকে জানালেন এই ব্যাপারে আমাদের জড়ানোর প্রচুর চেষ্টা করেছে পুলিশ। কিন্তু তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন "আত্মহত্যা"।

বহরমপুর জেলে থাকা কালীনই আমরা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আর

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের খবর পাই। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বহরমপুরে যে প্রাণস্পর্শী শোক শোভাযাত্রা বের হয়েছিল আজও তা' আমার মনে আঁকা আছে। অশ্রুসিক্ত অন্তর দিয়ে আমরা সে মিছিলের সামিল হয়েছিলাম।

এই জেলে বন্দী অবস্থাতেই আমরা মহাত্মা গান্ধীর সাথে বে-আইনী মোলাকাৎ করেছি। জেলের পাশে বাঁধের উপরে একখানা টেবিলে চড়ে তিনি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করেছেন। আমরা ছাদে যাবার গেটের তালা ভেঙ্গে ছাদে গিয়েছিলাম তাঁকে অভ্যর্থনা করতে।

এর পরই ১৯২৫ সালে নভেম্বর মাসে প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আমরা আটজন অন্য প্রদেশের জেলে প্রেরিত হলাম। প্রথম ব্যাচে হাজারীবাগ জেলে গেলেন শ্রীরমেশ আচার্য, শ্রীযোগেশ চ্যাটার্জি, শ্রীসন্তোষ দত্ত আর শ্রীশ্যামানন্দ সেন। দ্বিতীয় ব্যাচে একই দিনে মধ্য প্রদেশের বেতুল জেলে স্থানান্তরিত হলেন শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী ও শ্রী প্রতুল চট্টাচার্য আর ঐ প্রদেশের দামো জেলে নেয়া হল আশুদাকে এবং আমাকে।

দামো জেলের জীবন বৈচিত্র্যহীন। তবে জেলার আর তরুণ জেল ডাক্তার শ্রীমনদেও খট্ আমাদের সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছেন। জেল সুপার মেজর হার্ভেও বেশ ভাল ব্যবহার করেছেন।

একবছর দামো জেলে কাটানোর পর আমি বদলী হলাম আলীপুর সেন্ট্রালে আর আশুদা বদলী হলেন মেদিনীপুর জেলে।

আলীপুর জেলে তখন থমথমে ভাব। জেলের মধ্যে আই বি, বিভাগের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ভূপেন চ্যাটার্জির হত্যাপরাধে অনন্ত হরি মিত্র আর প্রমোদরঞ্জন সেনের ফাঁসী হয়ে গিয়েছে। মিঃ হাচিন্স আই, সি, এস্ আলীপুর জেলের ভার নিয়েছেন। রাজবন্দীদের প্রহরায় নূতন নূতন গোরা সার্জেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। রাজবন্দীদের নেতা ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ' জেল কর্তৃপক্ষের – বিশেষ

করে মিঃ হাচিন্সেব সাথে রাজবন্দীদের বিরোধ চলছে ডাঃ মুখার্জির নেতৃত্বে। এই সময় প্রায় ত্রিশ বত্রিশ জন রাজবন্দী ছিল আলীপুর জেলে। তাঁদেব মধ্যে যাদুদা ছাড়া মলঙ্গা লেনের ৺অনুকূল মুখার্জি, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নাযক শহীদ সূর্য সেন, অন্যতম নায়ক শহীদ নির্মল সেন, শ্রীগণেশ ঘোষ, শ্রীঅনন্ত সিং দক্ষিণ কলিকাতাব—কুশাগ্রবুদ্ধি তরুণ বিপ্লবী নায়ক শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি, চট্টগ্রামেব শ্রীচারুবিকাশ দত্ত, প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীচৈতন্য দেব চট্টোপাধ্যায়—লেখক ও সমালোচক শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কর্তাদেব সাথে বিরোধেব পরিণাম প্রাযোপবেশন। দশদিন চলেছিল এই hunger strike. হাচিন্স সাহেবের কড়া নজর আর চূড়ান্ত সতর্কতা সত্ত্বেও জেলের খবর বাহিরের কাগজে ফলাও করে বের হল। অমৃত বাজাব অনশন ব্রতী বিপ্লবীদের পরিচয় এক এক করে তুলে ধরল জনসাধারণেব কাছে। আমাব সম্বন্ধে লিখল—'We personally know Jitesh. He is nothing but a bag of bones' যা' হোক—ছুটে এলেন শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—ছুটে এলেন আমার দাদা। যাদুদার নির্দেশক্রমে রাজবন্দীদের প্রতিনিধি হয়ে Stretcher এ শুয়ে আমিই গেলাম জেল গেটে। অমরদা আর দাদার সামনে হাচিন্স সাহেবের সাথে কিছু কথা কাটাকাটি হল। হাচিন্স সাহেবের লিখা আপত্তিজনক পত্রগুলি রাখলাম অমরদাব সামনে। অবশেষে তাঁবই মাধ্যমে মিটমাট হযে গেল। হাচিন্স সাহেব ত্রুটী স্বীকার করে কেড়ে নেয়া সুযোগ সুবিধাগুলি আবার চালু করলেন। আমিও আনন্দ চিত্তে বন্ধুদের কাছে ফিরলাম।

সাথীদের সাথে আনন্দেই দিন কাটছে। যাদুদার নির্দেশমত পড়াশুনা করছি আমি। সূর্য বাবু ও নির্মল বাবুর কাছে মাঝে মাঝে যাই,—আলোচনা করি। যাদুদা চট্টগ্রামের বন্ধুদের সব একধারে রাখার

ব্যবস্থা করেছেন। ওয়ার্ডের সেই অংশটুকুর নাম দিয়েছেন মগপল্লী। বাস্তবিকই ওঁরা যখন নিজেদের মাঝে আলোচনা করেন মনে হয় কথার কাঁটাতার দিয়ে অঞ্চলটী ঘিরে রেখেছেন। এই বেড়ার বাহিরে ছিলেন চট্টগ্রামের শ্রীচারুবিকাশ দত্ত, শ্রীযশোদা চক্রবর্তী, শ্রীপ্রতাপ রক্ষিত আর শ্রীঅনিল বড়ুয়া, সব অনুশীলনের সভ্য।

একদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি হাচিন্সের সাথে একজন সাহেব এসে শচীন নামের জনৈক রাজবন্দীকে ধমকাচ্ছে। জমাদার সেপাই গিজ্ গিজ্ করছে ঘরের ভেতরে। আমি এগিয়ে গেলাম। শ্বেতাঙ্গপুরুষকে প্রশ্ন করলাম—Who are you?' জেল সুপার মিঃ হাচিন্স জবাব দিলেন—He is Mr. Martin, Addl. Deputy Secretary., Pol. Dept. আমার মেজাজ তখন সপ্তমে। দৃঢ়কণ্ঠে বললাম—He may be deputy Secretary or a police-spy,—that does not matter. I say - he has no authority to bellow like an ox at a state-prisoner inside the jail. রাগে মার্টিন সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন—I have come to you to convey rebuke from the Government. আমিও ততোধিক চেঁচিয়ে বললাম—Convey our rebuke to the Govt. which stands self-condemned for detaining people without trial. So, please, "clear out".

রাগে লাল সাহেবরা নেমে গেলেন। তখন বেলা প্রায় দুটো। সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে জেল গেটে আমার ডাক প'ল। যাদুদা হাসিমুখে বললেন 'চাবীটা দিয়ে যাও—তোমার বাক্স-বিছানা গুছাই।" জেল অফিসে গিয়ে বুঝলাম যাদুদার অনুমান মিথ্যা নয়। এক ঘন্টা পরই দার্জিলিং মেলে আমার যেতে হবে জলপাইগুড়ি জেলে।

পুলিশ অফিসার, সার্জেন্ট পরিবৃত হয়ে সাত বছর পরে আবার হাজির হলাম জলপাইগুড়ি জেলে। তবে এবার সেলে নয়। প্রাচীর ঘেরা ফিমেল ওয়ার্ডে কেউ ছিল না। সেখানেই রাখা হ'ল আমাকে।

এই জেলে তখন ক্ষেত্রদা'ও (সিংহ) ছিলেন। তবে তাঁকে রাখা হয়েছে Seggregation ward-এ। দু'চার দিন পর জেল সুপারের কাছে দু'জনে একত্রে থাকার অনুমতি চাইলাম। পেলামও। এর পরই সুরু হল দুজনেব অন্তহীন বক-বকানি। বন্ধনের মাঝে আনন্দ! রুদ্ধকারার বদ্ধ ঘবে দুজন রাজবন্দী বিশাল ভারতের তেত্রিশ কোটী অধিবাসীর সর্বাঙ্গীন মুক্তির কল্পনায় বিভোর! এ যেন কবিগুরুর 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" অথবা "অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ মহানন্দময়।"

যাক—কিছুদিন পর ক্ষেত্রদাও বাহিরে গেলেন অন্তরীণ হয়ে। রৈনু বাঁকী আমি! মনে মনে হয়তো বা গেয়েছিলাম "হরি পার কর আমারে।" মাস দু'তিন পব তাই বোধ হয় জলপাইগুড়ির পুলিশ সাহেব—সম্ভবতঃ মিঃ জোন্স—পারে যাবার পারানী স্বরূপ একটা undertaking নিয়ে হাজির হলেন জেলে আমার কাছে। আমার তখনও জগাই-মাধাই মনোভাব পুরোপুরিই রয়েছে। কাণাকড়ি দিয়েও পার হতে চাইনে। সাহেব অনেক বুঝালেন। নামকরা নেতাদের মধ্যে কে কে undertaking দিয়ে পার হয়েছেন তারও ফিরিস্তি দিলেন। জবাবে নির্ভেজাল গালাগালি পেয়ে গোঁসা ভরে ফিরে গেলেন। আরও কিছুদিন কাটল একা একা। তারপরই নদীয়া জেলার হাঁসখালি থানায় অন্তরীণের আদেশ নিয়ে এলাম বাহিরে।

যদি সরকারের সর্ত মেনে নিতাম রাজনৈতিক গর্তে পড়তাম নিশ্চয়।

আট

কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলার পুলিশ—সুপার মিঃ রেভিনের সাথে দেখা করলাম। পাঁড় মাতাল,—কিন্তু কর্মচারী হিসাবে অতি উচ্চ স্তরের। তাঁর কাছ থেকে অন্তরীণের বিধি নিষেধের আদেশনামা নিয়ে গেলাম হাঁসখালি থানায়। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। আমার জন্য নির্দিষ্ট বাসায় তিনি নিয়ে গেলেন। দোতলা, ছোট্ট বাসা। লোকালয়ের মধ্যেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখি দেয়ালে বড় বড় হরফে লিখা রয়েছে— "হে এই গৃহের অনাগত অতিথি," আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী।

বিনয়েন্দ্র মোহন। মৈমনসিংহের বিনয়—যাদের বাড়ীতে মহারাজ ধরা পড়েছিলেন! বিনয় পরে সুসাহিত্যিক আর অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এখন সে ভারত সরকারের চাকুরীতে আছে।

গ্রামের লোকজনের সাথে আলাপ হল। চার ঘর ভদ্রলোক— আর সবই সাধারণ শ্রেণীর। শ্রীযুত হরেন রায় ও তাঁর ছেলে আশু বাবু আত্মীয়ের মত ব্যবহার করতেন। এঁদের কাছেই শুনেছি যে বিনয়ের পূর্বে মৈমনসিংহের আনন্দ বাবু (মজুমদার) হাঁসখালিতে অন্তরীণ ছিলেন। আনন্দ বাবু আমার পরিচিত—বহরমপুর জেলে একত্রে ছিলাম।

বাসাটী ছিল সর্প-সঙ্কুল। সাপ ইচ্ছামত ঘোরা ফেরা করত। ওরা প্রায়ই বৈষ্ণব; মহাপ্রভুর দেশের তো!

এখানে থাকা কালে দুটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। একটা জলার মাছ মারা নিয়ে জমিদার আর প্রজাদের মধ্যে সংঘর্ষে বন্দুকের গুলীতে কয়েকটী প্রজা নিহত হয়। থানা কর্তৃপক্ষের কারসাজিতে প্রজাদের মামলা ফেঁসে যায়। এই সময়টায় দারোগাবাবু আমার দু বেলা থানায় হাজিরা দেয়া মকুব করে দিয়েছিলেন। বড় জমাদার ছিলেন দেবেন বাবু। একদিন রহস্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'দেবেন বাবু! কিছু পেলেন টেলেন?" জবাবে দুঃখের হাসি হেসে তিনি বললেন—"জমাদার হচ্ছে দারোগার ঘোড়া। আসামীরা পুজো আর্চা দেবতাকেই করে, বাহনকে নয়।"

আমি অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলাম—জমাদার দারোগার ঘোড়া! মানে?

—'মানে জমাদারের বেতন ত্রিশ টাকা—দারোগাদের ঘোড়া-ভাতাও ত্রিশ টাকা।"

"অর্থাৎ বলতে চান কিছুই উপরি নাই?"

—'আছে। দারোগাবাবু মহালে গিয়ে যখন ভক্তদলের পুজো সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন তখন পায়ে ছাঁদনা বেঁধে আমাদের ছেড়ে দেয়া হয়। সে সময় আমরা এর ওর জমিতে দু চার কামড় বসিয়ে দিই।

দ্বিতীয় ঘটনা আমাকেই ঘিরে। কৃষ্ণনগর পুলিশ ক্লাবে আমার পার্কার পেন চক্ষের নিমেষে উধাও হয়। পুলিশ ক্লাবের স্থায়ী মেম্বারেরা সন্দেহ করেন এটা আলমডাঙ্গা থানার ছোট দারোগার কাজ। তাঁরা কলমটী উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হননা। প্রায় তিন মাস পরে আলমডাঙ্গায় অন্তরীণ শ্রীবঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় লোক যোগে আমাকে খবর পাঠায় "ছোট দারোগা পরম পাজী। আমাকে খুব জ্বালায়। আপনার চুরি করা কলম বেটা প্রকাশ্যে ব্যবহার করছে। জব্দ করুন।"

মিঃ পি, ডি, এল কেলী তখন নদীয়ার পুলিশ—সুপার। আমি তাঁর কাছে একখানি শীলআঁটা পত্রে সব ঘটনা জানাই। চার পাঁচদিন পর একদিন প্রাতে হাজিরা দিতে গিয়েছি থানায়। সবে মাত্র বসেছি চেয়ারে। কে যেন এসে আমার পা দুটো চেপে ধরল। চেয়ে দেখি আলমডাঙ্গার শ্রীমান ছোট দারোগা। রাসবিহারী বাবু জানালেন S,P. কেলী সাহেব D.S.P কে পাঠিয়ে কলমটা ধরেছেন। আমার ডাক পড়েছে কৃষ্ণনগরে। কিন্তু বেচারাকে বাঁচাতে হবে—নইলে ছেলেপুলে নিয়ে মারা যাবে।

রাসবিহারী বাবুর অনুরোধে আমার ক্যাশমেমো এনে দিলাম। কৃষ্ণনগরে গিয়ে সাহেবকেও জানালাম—It looks like mine. But I cannot exactly say that the pen is mine.

বেচারা বেঁচে গেল।

* * * *

আর একটা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম আমি। হাঁসখালিতে জোর কলেরা লেগেছে। স্যানিটারী বিভাগ তখন নূতন খুলেছে। স্যানিটারী ইনস্পেক্টর এলেন। পরিচয়ে জানলাম আমার বন্ধু তারাদাস ভট্টাচার্যের ভাগনে। কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে এক শিশি টুমস্ সলিউশন তিনি আমাকে দিয়ে গেলেন। প্রয়োগ বিধিও জানালেন। দু'তিন দিন পরই আমার পাশের বাড়ীর একটী স্ত্রীলোক জোর বমি করছে। নিশ্চয় কলেরা। ত্রাণ কর্তা হিসাবে গেলাম সেখানে। ত্রিশ ফোঁটা টুমস্ সলিউশন দিলাম ঠুকে। রোগী চীৎকার করে উঠল বুক গেল—পেট গেল। ছটফট করতে লাগল কাটা পাঁঠার মত। ছুটে এলাম বাসায়। কালী, হরি দুর্গা শিব সকল দেবতাকে ডাকতে লাগলাম কাতর কণ্ঠে। তাতেও পার না পেয়ে দশটী টাকা রোগীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম কেষ্টনগর থেকে ডাক্তার আনতে। ডাক্তার

এসে অনেক চেষ্টায় রোগীকে ধাতে আনলেন। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। পরে শুনি ও হরি! রোগ মোটেই কলেরা নয়,—টাইফয়েড! সে হালুয়া!

এই সময় খবর পেলাম আমার দাদা গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাঁকে নাটোরে আনা হয়েছে। আমি তাঁকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটীর দরখাস্ত করলাম। ছুটী মঞ্জুর হ'ল। এলাম নাটোরে। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে শ্রীক্ষিতীশ দেব প্রত্যহই আমার সাথে দেখা করত। তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল আমার মাসতুতো ভাই জ্ঞানেন্দ্র সান্যাল। জ্ঞানেন্দ্রের চেষ্টায়ই নাটোরে অনুশীলন দল পুনর্জীবন লাভ করে—আর তাকে পরিচালন করে ক্ষিতীশ। এদের মাধ্যমেই নাটোরে শ্রীতারক দাস শ্রীবকুল রায়—প্রভৃতি কর্মীদের সাথে আমি মেলামেশার সুযোগ পাই।

জ্ঞান আর ইহজগতে নাই। কালের নির্মম আকর্ষণে অকালেই ধরণীর বুক থেকে সে সরে গিয়েছে। জীবনে বহু সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে দেশের সেবায় সে দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিল। তাই দরিদ্রদের জন্য প্রতি সংগ্রামে নির্ভীকভাবে সে এগিয়ে যেত। নিজের জন্য চিন্তা নাই—সংসারের দারিদ্র্যে ভ্রূক্ষেপ নাই। নির্ভীক, বে-পরোয়া গণ-সংগ্রামী নায়ক ছিল জ্ঞান। বহু রাজ-নিগ্রহও সে সহ্য করেছে এর জন্য।

ছুটীর ম্যাদ ফুরুলো। ফিরে গেলাম হাঁসখালিতে। আবার এল undertaking দিবার প্রস্তাব। এবার সংযত কিন্তু দৃঢ় জবাব দিলাম দীর্ঘ পত্রে। সুতরাং আমার মুক্তি হল না। দুমাস পরে স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ হল। কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের—ঠিক পূর্বে সর্তাধীনে মুক্তি পেয়ে দর্শক হিসাবে যোগ দিলাম কংগ্রেসে। বন্ধুদের অনেকেই কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাবিলদার, ক্যাপ্টেন,

মেজর। সুভাষ বাবু জি, ও, সি। বিরাট হৈ চৈ। তারই অন্তরালে বিপ্লবীরা শক্তিবৃদ্ধির তালে ছিল। বহু পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হল। কংগ্রেসে এসে এই প্রথম সংঘবদ্ধ মজুর শ্রেণীর শক্তি প্রত্যক্ষ করলাম। কি-ই বিরাট মিছিল! সুভাষ বাবুর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিরোধ সত্ত্বেও দৃঢ় পদে অগ্রসর হয়ে তারা কংগ্রেস প্যাণ্ডেল দখল করে নিল,—প্রোগ্রাম মত কাজ সেরে—শান্তভাবে বেরিয়ে গেল।

কংগ্রেস অধিবেশনে স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ নিম্বকার, মিঃ যোগলেকার—আর মিঃ মেহের আলী পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থনে জোরালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন মিটলো। ফিরে এলাম রাজসাহীতে। আবার জড়িয়ে পড়লাম ফুস্-ফুস্ গুজ-গুজে। রাজসাহীতে তখন শ্রীসুবিমল সরকার, শ্রীসুধাংশু ওরফে টুনু মুখার্জি, আদ্যনাথ, কালীদাস, ত্রৈলক্য সেন, অমলেন্দু বাগচী, অম্বিকা মৈত্র, বিরজা বসু প্রভৃতি কর্মীরা সমিতির দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। শীতাংশুও পিছিয়ে ছিল না। টাকার যোগাড়ে কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন এঁরা। নাটোর রোডে ডাকলুট তার অন্যতম। সহর বেশ সরগরম। শহর থেকে দূরে না থাকলে আমার মত দাগী আর ঘাগী লোকের বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে। তাই গ্রামে গেলাম। কিন্তু উপায় উপার্জন নাই —দিন চলে কেমন করে? আমাদের দু ভাই জেলে থাকার সময়—সম্পত্তি, জোত-জমা সব উচ্ছন্নে গেছে। বসে বসে খাওয়া চলবেনা। আবার—পুলিশের কড়া নজরও এড়াতে হবে। সব দিক ভেবে চিন্তে আমার পিসতুতো ভাই - শ্রীঋতেশচন্দ্র তলাপাত্রের সাহায্যে পুঠিয়া রাজ এষ্টেটে—ইনস্পেক্টরি চাকুরী নিলাম। এর ফলে লাভ ক্ষতি দুইই এল। আপামর জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ অসম্ভব বেড়ে গেল।

তাদের সমস্যা, জীবন যাত্রা, রীতিনীতি আর সামাজিক প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পেলাম; পরিচিত হলাম জেলার দুর্গম গ্রামাঞ্চলের সাথে। অপর দিকে সমিতির সাথে যোগাযোগ শিথিল হতে লাগল। তবু চেঙ্কু, চুনু, ত্রৈলক্য, অমলেন্দু আর—ক্ষিতীশ দেব আমার কাছে মাঝে মাঝেই যেত—এবং কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করত। মাঝে মাঝে আমিও শহরে এসে শলা-পরামর্শ করে যেতাম।

১৯২৯ সালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন হয়—রংপুরে। আমি তখন জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্য। ডেলিগেট হয়ে—গেলাম রংপুরে। ট্রেনের মাঝে দেখা হল অম্বিকা বাবুর সাথে। বড বড় দাড়ি রেখে বেশ সভ্যভব্য হয়েছেন। আমার সাথে ছিল আমার ভাগ্নে জগদীন্দ্র মৈত্র। চক্রবর্তী মশায় জমে গেলেন তার সাথে। আমি হেসে বোললাম 'বড় কঠিন ঠাঁই, দাঁত বসবেনা।'

রংপুরে সুভাষ বাবুর সাথে আবার দেখা হল। বহু পুরানো বন্ধুর সাক্ষাত পেলাম। তখন অনুশীলন আর যুগান্তরের মিলন হয়েছে। স্বর্গত পূর্ণ দাস আমাদের সাথে কাজকর্ম সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করলেন। শ্রীযুত সতীশ দাশগুপ্ত আর আমাদের যতীনদা—গঠনমূলক কার্যসূচী নিয়ে একটা উত্তরবঙ্গ-সমিতি গঠনের প্রস্তাব তুললেন। আমি প্রবলভাবে বাধা দিলাম। মনে হল সতীশ বাবু খুব চটে গেলেন আমার উপরে।

যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও সতীশ বাবুর গান্ধীজির নকল-নবিশী করা আমার মোটেই ভাল লাগত না। প্রখর বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, স্বার্থত্যাগ আর অপূর্ব সংগঠন কুশলতায় তিনি বাংলা দেশের মহার্ঘ সম্পদ। এই প্রচণ্ড কর্মশক্তি ময়লা সাফাই আর চরকাতে বাঁশ দানে ব্যয় করা আমি জাতীয় অপচয় বলে মনে করি। যে সতীশ বাবু পাঁচটা বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ার শক্তি রাখেন তিনি খড়ম পায়ে,

গান্ধীজির অনুকরণে লাঠি হাতে, কাপড়ের পাইড়ে বাঁধা ঘড়ি ট্যাঁকে ঝুলিয়ে—চরকায় বংশ-সংযোগ মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াবেন, এটা দেশের দুর্ভাগ্য।

রংপুর প্রাদেশিক যুব সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বাংলার অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রংপুর নাট্য সমিতি তাঁর দত্তা—dramatise করে মঞ্চস্থ করেন। শরৎচন্দ্রের সাথে আমরাও আমন্ত্রিত হলাম—দত্তার অভিনয় দেখার জন্য। শরৎচন্দ্রের কাছে বসে—ভবানীপুরের শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির কথা মনে পড়ে গেল! প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক ৺শচীন্দ্র সান্যালের বার্তা নিয়ে একদিন বিশ্বনাথ গিয়েছিলেন হাওড়ায় শরৎচন্দ্রের বাসায়। ফেরার সময় সাইকেলে লাইট না থাকায় পুলিশ তাঁকে ধরে। অনেক অনুনয় বিনয় করে আর চরিত্র হীনতার 'ববরণ দিয়ে বিশ্বনাথ সে যাত্রা অব্যাহতি পান। শচীন বাবু শরৎচন্দ্রকে এ ঘটনা বলেন। পরে আর একদিন বিশ্বনাথ সন্ধ্যার আগে যেমনি গিয়েছেন শরৎচন্দ্রের কাছে—শরৎচন্দ্র তাঁকে জলযোগে বসিয়ে দিয়ে—সাইকেলের লাইটে কেরোসিন ভরতে লেগে গেলেন।

আরো শুনেছিলাম পাশের বাড়ীর একটী গাভী প্রসবে কষ্ট পাচ্ছে খবর পেয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুদের বাক্স নিয়ে শরৎচন্দ্র সারারাত গোয়ালঘরে কাটিয়েছেন। এই দরদী মানুষটী শরৎ সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে রূপ পেয়েছে।

সম্মেলন অন্তে ফিরে এলাম রাজসাহী। বাড়ী আর গাড়ী যেমন বিত্তের বিদুষক, বাংলা দেশে চাকুরীর বিদুষক বিয়ের প্রস্তাব। একজন অবিবাহিত চাকুরে আছেন জেনে তাঁর মনোরঞ্জনার্থে—বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল চারিদিক থেকে। অনেকে ভয়ে পিছিয়েও গেলেন। একে জামাই হবেন 'বয়সে বাপের বড়'—অপর দিকে গুণে তিনি M.A. of the Presidency Jail',—তদুপরি বিহার আর মধ্যপ্রদেশের

জেলের ডক্টরেটও পেয়েছেন। কিন্তু বাংলা দেশে সাহসী লোকের অভাব নাই। বহু হতভাগ্য পিতা দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে গঙ্গাযাত্রীর গলায় মেয়ে ঝুলিয়ে দেন। আর এক ধরণের পিতারা—আমার বার বার জেলে যাওয়াটাকে চরিত্রহীনতা ব্যাধির সমতুল সমঝে ধরে নিলেন 'বিয়ে হলেই সেরে যাবে।' এই উভয় প্রকার ভদ্রলোকরাই—মাঝে মাঝে হানা দিতে লাগলেন আমার বাড়ীতে। বৌদি আর দাদাও তাঁদের দিকে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে—শ্রবণ, মনন, দর্শনে প্রেম সঞ্চার হয়—অনুরাগ জন্মে। তিনটাই চলছিল পুরোদমে। ফলে, মনে হল অনুরাগের রঙ্গীন হাওয়ায় আমার মনটাও মৃদুমন্দ দুলছে। বিয়ের অনুকূলে এর আগে দাদা যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন এতদিন সে সব হেসেই উড়িয়েছি। এবার মনে হতে লাগল দাদা বেশ বলেন! বেশ বুদ্ধিতো দাদার! তাঁর কথা—বিয়েকে বিপ্লবের কাজে লাগাতে হবে, প্রতিপক্ষকে প্রতারণার আবরণ হিসাবে একে ব্যবহার করতে হবে—বেশ যুক্তিপূর্ণই মনে হ'ল। আগে এ সব যুক্তিকে লেজ-কাটা-শেয়ালের—লেজকাটার অনুকূলে ওকালতী রূপেই গণ্য করেছি। যাক্—বিয়ে করলাম, অর্থাৎ ফাঁদে পা দিলাম,—যেমন দিয়ে থাকে শতকরা ৯৯টা লোক। এখন দেখছি বিবাহ ব্যাপারে অপর পক্ষ কংগ্রেসের চেয়েও শক্তিশালী। বিপ্লবীরা কংগ্রেসকে গ্রাস করতে গিয়ে বারো আনা কংগ্রেসের কুক্ষিগত হয়েছেন,—কিন্তু এই অপর পক্ষেরা বিপ্লবীদের যোল আনাই গ্রাস করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে মায় অতীতের স্মৃতি সমেত।

ভেবেছিলাম বিয়েতে কাকেও খবর দেব না,—গোপন-পথ-চারীর বিয়ে গোপনেই হবে। কিন্তু কোত্থেকে খবর পেয়ে টুনী ব্যানার্জি, অমলেন্দু বাগচী, শচীন খাঁ আর বিজন সেন ওরফে চুনু গিয়ে হাজির। আবার এমনি গ্রহের ফের জীবনদা—আর হারাণ

রক্ষিত ঠিক সেই দিনই গিয়েছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমার বিয়ের ছয় সাত মাস পরে বৌদি পরলোক গেলেন। দু'টী ছন্নছাড়ার জীবনে সংসারের ছিরি-ছাঁদের সূত্রপাত করেই তিনি বিদায় নিলেন অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে। এই আঘাতে দাদা কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন গণ-আন্দোলনের সংশ্রব থেকে। আমার কিন্তু সময় নাই। সামনে ইষ্টারের ছুটীতে রাজসাহীতে প্রাদেশিক সম্মেলন। আমাদেরই সব ব্যবস্থা করতে হবে। রাজসাহী জেলায়—সকল উদ্যোগ আয়োজনের, সর্বপ্রকার আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতৃত্ব অনুশীলন সমিতির হাতে। রাজসাহী জেলার প্রত্যেকটী প্রধান স্থানের যুবশক্তি তারই পশ্চাতে।

আমরা দলে দলে সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হলাম। লেগে গেলাম জেলার সব অঞ্চলে চাঁদা সংগ্রহের কাজে। বেশ সাড়া পড়ে গেল। আমাকে এজন্য প্রায়ই রাজসাহীতে যেতে হত। আমাদের পার্টির প্রধান প্রধান কর্মীরা প্রায়ই সম্মিলিত হত আলোচনার জন্য। এ সময়ে রাজসাহী জেলায় আমাদের যে শক্তি ছিল তাতে আমরা অনায়াসে সম্মেলনের সব কর্তৃত্ব দখল করতে পারতাম। কিন্তু জনসাধারণের চিত্তজয় আমরা করতে পারতাম না,—সর্বশ্রেণীর লোকের সমর্থনও পেতাম না অথচ গণ-আন্দোলনে এর গুরুত্ব সর্বাধিক!

সহকর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনায় আমরা আগে থেকেই প্ল্যান ছকে রেখেছিলাম। তাই অভ্যর্থনা সমিতির নির্বাচনে সভাপতি করা হল রোগজীর্ণ জননায়ক শ্রদ্ধাভাজন সুদর্শন চক্রবর্তী মহাশয়কে। সাধারণ সম্পাদক হলেন রাজসাহীর মহান সন্তান সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র মহাশয় আমাদের অতি প্রিয় সুরেন দা। সরল, উদার-প্রাণ সুরেন দা রাজনীতির প্যাঁচ ট্যাঁচ বিশেষ বুঝতেন না,—দলাদলিরও ধার ধারতেন না। তাঁর রাজনীতি বুড়ী ছোঁওয়া রাজনীতি,—যে দিকে সুভাষচন্দ্র সেদিকে তিনি।

শ্রীযুত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি, মনি মিত্র, সুধাংশু চৌধুরী, ৺বঙ্কিম রায়, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ চৌধুরী আর আমি বিভাগীয় সম্পাদক নির্বাচিত হলাম,—ক্ষিতীশ দেব, ত্রৈলক্য সেন, হেমন্ত নাগ অনিল বটব্যাল প্রভৃতি অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্মীরা সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। প্রাদেশিক সম্মেলনের সাথে সাথে আরও তিনটী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল—All Bengal Youth Conference, Workers' Conference এবং Young Comrades League Conference.

যথাসময়ে মূল সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিপ্লবী জননায়ক শ্রদ্ধেয় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, যুব সম্মেলনের সভাপতি শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, কর্মীসম্মেলনের সভাপতি শ্রীত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে মহারাজ আর ইযং কমরেডস লীগ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত খ্যাতনামা কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীবঙ্কিম মুখার্জি। আমি নিখিলবঙ্গ যুব সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম।

জেলা জুড়ে অভুতপুর্ব কর্মচাঞ্চল্য। শহর যেন উন্মাদনায় ফেটে পড়ছে। হাজার খানেক পুরুষ ও নারী ভলান্টিয়ার প্রতিদিন কুচকাওযাজ করছে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা দিতে কোলকাতা থেকে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোরের শ্রীহীরালাল দে'কে আনা হয়েছে। তাঁর অধীনে পুরুষ বিভাগে ক্যাপ্টেন হয়েছে সুরেনদার ছেলে গোরা মৈত্র এবং ত্র্যম্বকেশ রায় আর মহিলা বিভাগে—ক্যাপ্টেন হয়েছে সুরেনদার মেয়ে মীরা এবং তারই বন্ধু হেনা ভট্টাচার্য্য।

নির্দিষ্ট দিনে নেতৃবৃন্দ এসে গেলেন। বাংলার প্রত্যেক জিলা থেকে দলে দলে ডেলিগেট হাজির হলেন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সুরু হল সম্মেলন। সম্মেলন প্রাঙ্গনেই লবণ তৈরী করে আইন অমান্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর ঠিক সম্মেলনের দিনেই আমার প্রথম গ্রন্থ 'বিপ্লবীবীর নলিনী বাগচী' প্রকাশিত হল। নির্বিঘ্নেই কেটে গেল

প্রথম দিনের অধিবেশন। কিন্তু রাত পোয়াতে পেলনা। রাত তিনটেয়—বিরাট পুলিশ বাহিনী চার সম্মেলনের সভাপতিদের বাসা আর ডেলিগেট ক্যাম্পগুলি ঘিরে ফেলেছে। সভাপতি চারজন গ্রেপ্তার হলেন। যুগান্তর আর অনুশীলনেব কর্তারা যে যে দিকে পারলেন কেটে পড়লেন। প্রথমে আমরা এই আঘাতের কারণ নির্ণয় করতে পারি নি। তাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিকমত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দুপুরেই আই, বি বিভাগের দারোগা সতীশ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে জানতে পারি চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হয়েছে, বিপ্লবীরা সরকারী অস্ত্রাগারগুলি লুণ্ঠন করে সহর দখল করেছে,—শ্বেতাঙ্গগণ দুর দরিয়ায় জাহাজের কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

সরকারের দমন অভিযান কোন পথ নেবে এবারে সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল।

সতীশ বাবু আজ বেঁচে নাই। শত্রুর অনুচর হয়েও শত্রুপক্ষের বহু গোপনবার্তা তিনি আমাদের দিয়েছেন। তাই আজ উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই।

পুলিশ নেতাদের নিয়ে প্রথমে সদর মহকুমা হাকিমের বাসায়, পরে জেলখানা অভিমুখে চলল। বিরাট জনতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে চলল পিছে পিছে। জেলহাতার গেটের কাছে জেল সিপাহীরা আমাদের বাধা দিল। উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। স্বেচ্ছাসেবকেরা—জেলহাতার গেট ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকতে চায়;—পিছনে আছে দুই তিন হাজার লোক। আমি এগিয়ে গিয়ে পুলিশ সুপার ফিলিপ সাহেবকে গেট খুলে দিবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালাম। ফিলিপ সাহেব অবস্থার গুরুত্ব বুঝে জেল সিপাইদের সরিয়ে দিলেন। আমরা নেতাদের ঘিরে জেলহাতায় প্রবেশ করলাম।

বিপিনদা প্রতুলদা, মহারাজ আর বঙ্কিম বাবু জনতাকে লক্ষ্য করে

ভাষণ দিয়ে জেলে ঢুকলেন। আমরাও শ্লোগান দিতে দিতে সম্মেলন মণ্ডপের দিকে চললাম।

সেদিনের বিপ্লবীদের মধ্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ইয়ং কমরেডস্ লীগ সম্মেলনের অসমাপ্ত কার্যের পৌরহিত্য করলেন। সম্ভবতঃ সুরেনদা, বগুড়ার যতীনদা আর আমার দ্বারা মূল সম্মেলন, কর্মী সম্মেলন আর—যুব সম্মেলনের অসমাপ্ত কাজ চালানোব ব্যবস্থা কবা হয়।

সম্মেলন সফল করার আগ্রহে রাজসাহীর সকল শ্রেণীব লোকই এগিয়ে এসেছিলেন। বিশেষ করে আমার আবাল্য সুহৃদ শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্র ওরফে বাণ্ড শ্রদ্ধেয় শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, শ্রীবিজয় রায়, আর সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—আমাদের পরম পূজনীয় কালুদার অবদান উল্লেখযোগ্য। এঁরা কেউ আমাদের দলের নন। দলীয় বন্ধুদের মধ্যে মনি মিত্র, ৺সত্যরঞ্জন লাহিড়ী, শচীন খাঁ, সুধাংশু চৌধুরী, ক্ষিতীশ দেব, অমলেন্দু বাগচী, ৺বিজন সেন, ত্রৈলক্য সেন, টুনু মুখার্জি, কেষ্ট চ্যাটার্জি, রাধা, কালীদাস প্রভৃতি অদ্ভুত দায়িত্ব জ্ঞানের—পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে দলের সমস্ত সভ্যই আর সমর্থকরা স্থির সঙ্কল্প আর অভূতপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন এই উপলক্ষে। গোপন সমিতির কর্মী আমি। বহু স্থানে বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজেও লিপ্ত ছিলাম ইতিপূর্বে। কিন্তু এতদিন দলকে দেখেছি টুকরো টুকরো ভাবে। দলের জেলা ব্যাপী সামগ্রিক শক্তির সমাবেশ এর আগে এমন ভাবে কখনও দেখিনি। তাই গর্বে আর গৌরবে ভরে উঠেছিল আমার মন।

আর এক বন্ধুও পরম নিষ্ঠায় তাঁর কাজ করছিলেন। তিনি কিচেন কমিটিতে আমার সুযোগ্য সহকারী পেটুক প্রবর শ্রীহেমন্ত নাগ। শত শত বন্ধুর নিন্দা, গ্লানি, টিটকারীর মাঝেও তিনি ভ্রূক্ষেপহীন অচঞ্চল

চিত্তে নাটোরের কাঁচাগোল্লা ভক্ষণ করে যাচ্ছিলেন জাগ্রত কালের প্রতি ঘণ্টায়। অবশেষে আমাশয়-দানব তাঁর এই ভোজন-তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল।

এটা জানা কথা ছিল যে চট্টগ্রাম-অভ্যুত্থানের পর রাজসাহী জেলায় সরকারের প্রথম আঘাত পড়বে আমার উপর। প্রাদেশিক সম্মেলনের কিচেন কমিটীর সম্পাদক আমি। সব চেয়ে বেশী ব্যয় এখানেই। সুতরাং দায়িত্বও সর্বাধিক। আমার অবস্থা বুঝে শ্রীশচীন খাঁ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে—দু'দিনের মধ্যেই হিসাব খাড়া করলেন। সেই হিসাব আর প্রায় একহাজার টাকা বাগুকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ছুটে গেলাম স্বগ্রামে। রাজষ্টেটের সকল দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে ঋতেশদা'র কাছে।

প্রায় তিন মাস যাবত আমি কালাজ্বরে ভুগছিলাম। সম্মেলনের উত্তেজনায় শরীরের প্রতি দায়িত্বের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। শরীর নীরবে সইল না এ অবহেলা। নির্মম আচরণের প্রতিবাদে সে পাণ্টা জবাব দিল শয্যা গ্রহণ করে। জ্বর ১০৪° ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু গায়ে ময়লা মাখলে যমে ছাড়েনা। ভোরেই পুলিশ প্রভুরা এসে হাজির। দাদা ছিলেন দূরে। অসুস্থতার অজুহাতে পুলিশদের দু'দিন আটকে রেখে দাদাকে আনানো হল। আমার পূজনীয় শিক্ষক পল্লী-দেবতা স্বর্গত উমেশচন্দ্র অধিকারী আমাকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। দাদার নেতৃত্বে এক বিরাট জনতা আমাকে গ্রামের রেল ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিল। গ্রেপ্তার,—গৌরবে অবগাহন করল।

আমার গ্রেপ্তারের কথা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল জেলাময়। প্রাতের ট্রেণেই শহরে পৌঁছেছিল সে খবর। বেলা এগারোটায় আমাকে নিয়ে পুলিশ দল ট্রেণ থেকে যখন রাজসাহী ষ্টেশনে নামল তখন চোখে প'ল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য যার কথা আমি জীবনে ভুলব না।

দলে দলে লোক উন্মাদ আগ্রহে ছুটে আসছে রেল ষ্টেশনে। কারো গায়ে জামা আছে—কারো নাই। রাজসাহীর তরুণরা যে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই—উর্ধশ্বাসে ছুটে এসেছে।—ছুটে এলেন স্বর্গত জননায়ক সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, শ্রীযুত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি, শ্রীযুত তারানাথ রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ,—অপর পক্ষে সদল বলে ছুটে এলেন পুলিশ সুপার—ফিলিপ সাহেব স্বয়ং। মুহূর্ত মধ্যে ষ্টেশনের বিরাট চত্বর পূর্ণ হল জন সমাগমে,—মুহুর্মুহু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্লোগানে মুখরিত হতে লাগল দিঙমণ্ডল।

সম্ভবতঃ ত্রৈলক্যই চেঁচিয়ে উঠল 'জিতেশদাকে একা যেতে দেব না। ভাইসব! হাত ধরাধরি করে বেড়া দিয়ে আটকে দাও সামনের পথ। চক্ষুর নিমেষে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে—দাঁড়িয়ে গেল তরুণ বন্ধুরা—'যেতে নাহি দিব।' কালুদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। ফিলিপ সাহেবকে বললেন 'জিতেশকে আমরা আমাদের মোটরে নিয়ে যাই,—আপনি চলে যান,—পুলিশ পার্টি আমাদের আগে পিছে থাকবে।'

সেই ব্যবস্থা মত আমি সুরেনদা'র মোটরে উঠে,—জনতাকে শান্ত হতে আবেদন জানালাম। সুরেনদা আর কালুদার মাঝখানে আমি, সামনে পুলিশ ইনস্পেক্টর মিঃ হামিদ আর এ, এস্, আই পবিত্র বাবু। পিছনে একখানি গাড়ীতে সেপাই জমাদার। মোটর ছাড়ল। বিশাল জনতা শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হতে লাগল সাথে সাথে। যতই অগ্রসর হই ততই জনতার কলেরব বাড়ে। গোপন পথের যাত্রীর জীবনে জনতার আশীর্বাদ।—মুখরিত জয়ধ্বনির মাঝে ডুবে গিয়েছে অবসাদ আর সংশয়,—জনতার উৎসাহ, উদ্দীপনা আনে জয়-যাত্রার নূতন সম্ভাবনা। নিভৃত হোমানলের শিখা আজ ব্যস্ত হয়েছে দিকে দিকে, অতীতের, সমর্পিত প্রাণ বিপ্লব-সাধনার জ্বলন্ত মশাল গণ-

বিপ্লবীর হাতে সপে দিয়ে গোপন-পথ-চারী-বিপ্লবী আজ নিচ্ছে বিদায়—

হঠাৎ একটুকরো ইট প'ল মিঃ হামিদেব মাথায়। রক্তে রঞ্জিত হ'ল তাঁর মুখমণ্ডল। অপূর্ব ধৈর্যের পরিচয় দিলেন তিনি। রুমাল দিয়ে চেপে ধরলেন ক্ষত স্থান।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমি জনতার উদ্দেশে আবেগপূর্ণ আবেদন জানালাম,—সংযম আর শৃংখলা হারালে ব্যর্থ হবে আমাদের সংগ্রাম।

এরপব বাকী পথটুকু সুশৃংখলভাবে অতিক্রম করে বন্দীর শোভাযাত্রা শেষ হল লৌহ দ্বারের বাহিরে;—গগণবিদারী জয়ধ্বনির মাঝে আমি প্রবেশ করলাম কাবাগারে।

নয়

জেলে ঢুকেই পেলাম মহারাজ আর প্রতুলদাকে। বিপিনদা আব বঙ্কিমবাবু কোলকাতার জেলে বদলী হয়েছেন। সপ্তাহ মধ্যে খবর পাওয়া গেল আমার "বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচি" বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং আমার দাদার নেতৃত্বে রাজসাহীতে গণ-আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছে। কম্পাউণ্ডার ধীরেনবাবু এসব খবরাখবর যোগাতেন। মনি মিত্রের সাথে যোগাযোগ ছিল তাঁর।

প্রায় একমাস পরে রেজ্জাক খাঁ সাহেব, শ্রীকালী সেন, শ্রীপ্যারী দাস আর বন্ধু অমূল্য অধিকারী এসে আমাদের দল ভারী করলেন। আনন্দেই কাটলো কয়েক সপ্তাহ। এর পরই আমি বদলী হলাম হাওড়া এবং সেখান থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে।

বিরাট ব্যাপার এখানে। দেড়শো ডেটিনিউ আর নিত্য নূতন দল সত্যাগ্রহী। বহু পুরাতন বন্ধুর সাথে দেখা হল—সর্ব্বদাই হৈ চৈ।

আমাদের পাশের ব্যারাকেই সত্যাগ্রহীদের রাখা হত। ক্রমে সমস্ত জেলটাই যেন তারা দখল করে নিল। বিরাম নাই—আসছেই, আসছেই। এদিকে ডেটিনিউ বন্ধুরা তাদের মধ্যে জোর স্বদেশী চালিয়েছে। অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার সত্যাগ্রহীর মধ্যে বেছে বেছে বিপ্লবমন্ত্রের দীক্ষা দেয়া হচ্ছে। অবাধ মেলামেশার সুযোগ ছিল না। কিন্তু সকালে-বিকালে আমরা জেল-পুকুরের চার পাড়ে বেড়াতাম সত্যাগ্রহীদের ব্যারাকগুলির পাশ দিয়ে। এই জোর স্বদেশীর ফলে আমাদের কত জনের লুঙ্গি, নিমা, ধুতি, জামা প্রভৃতি দাদাদের দরদের নিদর্শন স্বরূপ উধাও হয়েছে। সাধে কি কবি বলেছেন—

সংসারেতে দাদা হওয়া কঠিন ব্যাপার
দাদা হতে হলে কর পর দ্রব্য পার।

যাক্! এই সময় প্রেসিডেন্সী জেলে যুগান্তর, অনুশীলনের নেতা আর বিশিষ্ট কর্মীদের অনেকেই ছিলেন। যুগান্তর দলের নেতাদের মধ্যে শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, শ্রীভূপেন্দ্র দত্ত সাতকড়ি বাবু আরও অনেকে ছিলেন। অনুশীলনের নেতাদের মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র আচার্য, রবীন্দ্রমোহন সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র ব্যানার্জী, বীরেন চ্যাটার্জি, ধীরেন মুখার্জি, সুশীল ব্যানার্জি, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত আরও অনেকে। অনুশীলনের নেতাদের নামের আগে 'শ্রী' দিলাম না বলে হয়তো আপনাদের বিশ্রী লাগছে। কিন্তু অনুশীলনের নেতা আর বিশিষ্ট কর্মীরা চিরদিনই শ্রীহীন আর যুগান্তরের নাম করা নেতারা সত্যিই শ্রীমান্। আজকের দিনেও এটা এক নজরে মালুম হয়।

ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, মৌলবী সামসুদ্দিন আর বিপিনদা সত্যাগ্রহী বন্দীরূপে আমাদের পাশেই ছিলেন। কিন্তু বিপিনদা'র দলের বিদ্রোহী নেতা স্বর্গত সন্তোষ মিত্র ছিলেন আমাদের মাঝে। সন্তোষবাবু নির্ভীক আর বুদ্ধিমান ছিলেন।

প্রচুর রাজবন্দী। সকলের বিষয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র যাঁদের চরিত্র ও আচরণ বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছে তাঁদের কথাই আজ বলি।

বরিশালের ফনী দাশগুপ্ত আর নলিনী সেন। দু'জনেই যুগান্তর দলের। এঁদের উদার হৃদয়, ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর বিপ্লবী আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

ঢাকার সুরপতি চক্রবর্তী। প্রতিভাবান পাগল। সাংসারিক জ্ঞান মোটেই নাই। কিন্তু কালো, কর্কশ আবরণের অন্তরালে আছে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতিভাময় দীপ্তি, রসাপ্লুত কল্পনার অনুভূতি।

রংপুরের শিবদাস লাহিড়ী আর বরিশালের ধীরেশ রায়। শিবদাস উৎসাহী প্রাণবন্ত আর ধীরেশ শান্ত, সমাচিত, নেতৃত্বের যোগ্যতা-সম্পন্ন। ধীরেন মুখার্জী আর প্রেমরঞ্জন। ধীরেন বাবুর চোখেমুখে বুদ্ধি ফুটে বেরোয়। কিন্তু আলস্যপরায়ণ অতিশয়। প্রেমরঞ্জন হাসির হররা। বীরেন চ্যাটার্জি—সনাতন নাবালক, দুরদৃষ্টকে ইয়ার্কীর চাপেই চেপে রাখলেন। দক্ষিণ কলিকাতার দেবেন বসুর দেহে অসুরের বল আর মাথার বেলায় তেমনি দুর্বল। বন্দবিলা সত্যাগ্রহের নেতা বিজয় রায়। কথা কম বলেন কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তায় দীপ্ত মুখমণ্ডল।

বিপ্লবী পরিচয় এখন থাক্। খবর পেলাম দাদা সদলবলে গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজসাহীতে। তাঁদের সব জেল হয়েছে। চেরু বীরু মানস, রাধা প্রভৃতি রাজসাহীর যুবনেতারা দাদাকে ফিরে পেয়ে অসীম উৎসাহে আইনের পর আইন ভঙ্গ করে ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরেবতী চক্রবর্তীকে বাধ্য করেছেন সকলকে গ্রেপ্তার করতে।

এধারে আমাদের জেলে এসে গেলেন বিখ্যাত জননায়ক ৺সতীন্দ্রনাথ সেন। সাথে সাথেই প্রেসিডেন্সী জেলের শান্ত আবহাওয়ায় দুর্যোগের লক্ষণ দেখা দিল। সঙ্কট-সৃষ্টি আর তার মুখে

নিজকে নিষ্করুণভাবে ঠেলে দেয়ার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল সতীন বাবুর। নিগ্রহ আমন্ত্রণের পরিকল্পনা নিখুঁৎ ভাবে করতেন তিনি। বৈঠকের পর বৈঠক করে তিনি সাব্যস্থ করলেন সত্যাগ্রহী—সর্বক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহী। দাবীপূরণ না হলে জেলেব বিধিনিষেধ তিনি মানবেন না,—জেল গেটের সামনে দলে দলে সত্যাগ্রহ করবেন। জেল সুপার মেজর হ্যানাকে চরম পত্র দেয়া হল। সঙ্কট ঘনিয়ে আসতে লাগল। আমরা প্রমাদ গণলাম। কিন্তু 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'? চরমপত্রের ধার্যদিন উপস্থিত। আমরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রহর গুণছি। সবেমাত্র মধ্যাহ্নের আহার শেষ হয়েছে,—বেলা প্রায় একটা। সহসা পাগলাঘন্টী বেজে উঠল। উদগ্রীব হয়ে আমরা ব্যারাকের জানালার ধারে সার দিয়ে দাড়ালাম। কিন্তু ঘন্টী আর থামেনা,—বেজেই চলেছে ঢং—ঢং—ঢং। এই আওয়াজের মধ্যেই জেলের গেট খুলে গেল। হুড়্ হুড়্ করে প্রথমেই ঢুকল ষাট সত্তর জন কোলকাতা পুলিশের গোরা সার্জেণ্ট,—কোমরে রিভলভার, হাতে বেটন। তাদের সাথে জেলের সার্জেণ্টরাও ছিল। ঢুকেই তারা দু'ভাগ হল—একভাগ অগ্রসর হল চুয়াল্লিশ ডিগ্রির দিকে, আর একভাগ ছুটল আমাদের ব্যারাকের অভিমুখে। আমরা ছুটে সিঁড়ির মুখে এগিয়ে গেলাম, নলিনী সেন, ফনী দাশগুপ্ত, পূর্ণানন্দ, জোভ চৌধুরী, দেবেন বোস্ সন্তোষ মিত্র—আর কয়েকজন বন্ধুর সাথে আমিও দাঁড়ালাম সামনে। কিন্তু সার্জেণ্টরা ব্যারাকে ঢোকার চেষ্টা করলনা,—ব্যারাকের লৌহ-কপাট তালাবদ্ধ করে ছুটে চলল সত্যাগ্রহীদের ব্যারাকের দিকে। চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে যে দল গিয়েছিল তারাও রাজবন্দীদের সেলে সেলে ক্ষিপ্রতার সাথে বন্ধ করে ছুটল সত্যাগ্রহী ব্যারাক অভিমুখে। সাথে সাথেই একদল সশস্ত্র পুলিশ পুকুরের চার পাড়ে সারি বেঁধে দাঁড়ালো,—প্রায় দুইশত পুলিশ আর জেল সেপাই লাঠি নিয়ে ছুটে

গেল সত্যাগ্রহী ব্যারাকের দিকে। জেলের অভ্যন্তরে সর্বশেষে প্রবেশ করল কলিকাতা পুলিশের জবরদস্ত কমিশনার মিঃ টেগার্ট, আই, বির ডি, আই, জি মিঃ লোম্যান, এস্, বির ডেপুটী কমিশনার মিঃ ডিক্সন, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ রক্সবার্গ আর বাংলা সরকারের অতিরিক্ত ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ হাচিন্স। বুঝতে বাকী রইল না গুলী বর্ষণের ব্যবস্থা নিয়েই এরা জেলে ঢুকেছে। মুহূর্ত মধ্যে সত্যাগ্রহী ব্যারাকগুলি থেকে উত্থিত হল বিপন্ন আর্তনাদ,—নির্বিচারে লাঠি চলল সত্যাগ্রহীদের ঘরে ঘরে। নিরস্ত্র বন্দীর উপর এই বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদ জানালাম আমরা চীৎকার করে—একদল সার্জেণ্ট দৌড়ে এসে আমাদের শাসিয়ে গেল "Wait, we are coming".

লাঠি, বেটনের গুতো পদাঘাত সমানেই চলেছে, পাগলা ঘণ্টীও অবিরাম বাজছে। তারপর দেখি আমাদের ওয়ার্ডের ভিতর দিয়েই সর্ব-জন-শ্রদ্ধেয় আত্মোৎসর্গী দেশনায়ক সতীন সেনকে রৌদ্র-তপ্ত অমসৃণ শানের উপর দিয়ে চিৎকরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে চলেছে চারজন সার্জেণ্ট। সতীন বাবুর মাথাটা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। চেতনা আছে কি নাই বোঝা যায়না। আমরা চীৎকার করে উঠলাম "Brute", ওদের পাল্টা গর্জন "Shut up or we shoot".

*　　*　　*　　*

পাগলা ঘণ্টা থেমে গেল। সরকারী পশুদের এই হিংস্র আক্রমণে গুরুতররূপে আহত হয়েছে ষাট সত্তর জন,—সামান্য আঘাত পেয়েছে দু' তিন শো। সত্যাগ্রহী-সংকল্পে মড়ক লেগে গেল—Bond দিয়ে বাহিরে যাবার হিড়িক এল।

তিনদিন অনশন করে আমরা সরকারী বর্বরতার প্রতিবাদ জানালাম।

এবার আক্রমণের মোড় ঘুরল আমাদের দিকে। আমাদের ব্যারাকগুলি রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকতো। আমরা যদৃচ্ছা অন্যান্য রাজবন্দীদের কাছে যাতায়াত করতাম, আলোচনা সভা বসাতাম,—জলসায় মিলতাম। কর্তারা একদিন সন্ধ্যাতেই তালা বন্ধ করলেন। পরদিনই সিঁড় আটকে আমরা বসে রইলাম,—তালা লাগাতে দিলাম না। পরে দুপুর বেলা আমাদের ওয়ার্ড থেকে বের হবার গেটে তালা চড়ল। জোভ চৌধুরী জমাদারের কাছ থেকে চাবী কেড়ে নিয়ে তালা খুলে ফেলল। জমাদার সিটি দিতেই পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠল। আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। সময় নাই এখনই সর্বনাশের মোকাবিলা করতে হবে। চকিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৺সন্তোষ মিত্র আর আমি ছুটলাম গেটে। গেটে কাঠের দোরের ফুটো দিয়ে দেখি লাঠী, বন্দুক নিয়ে সিপাইরা সমবেত হচ্ছে। আমি চীৎকার করে মিঃ আপসনকে ডাকলাম। তিনিই তখন কার্য্যরত জেল সুপার। মিঃ আপসান আমাকে চিনতেন। সশ্রম কারাদণ্ডের কালে এই জেলে তিনি ছিলেন ডেপুটী সুপার। তাঁর অধীনে আমাকে খাটতে হয়েছে বহুদিন। তাই আমাকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। সন্তোষ বাবু আর আমাকে জেল অফিসে নিয়ে গেলেন। গেটের ভিতরে তখনও সিপাই জমছে,—সকলে আদেশের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

মিঃ আপশনের মেজাজ বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হল। তিনি আমাদের অনুরোধে সিপাইদের ফিরিয়ে দিলেন। তবে জোভকে সাতদিন সেল-বাসের সাজা দিয়ে তিনি প্রেষ্টিজ্ বাঁচাতে চাইলেন। রাতটুকুই সে আলাদা থাকবে, এই সর্তে আমরা রাজী হলাম।

নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মীমাংসার পথে আমরা এগিয়েছিলাম; তাই এবারের মত আমাদের অনেকের জীবনই রক্ষা পেল।

তখন ভাবিনি। আজ কিন্তু ভাবি আমার এতখানি দায়িত্ব বোধ এল কোত্থেকে! তিন বছর আগেও আমার চরিত্র তো আপোষের উপযোগী ছিলনা! খুব সম্ভব বিয়ে আর পিতৃত্বই এই পরিবর্তন এনেছে,—চরিত্রে উদ্দামতার স্থানে স্থাপিত করেছে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর মমত্ববোধ।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সন্তোষবাবু আর আমি—উভয়েই বিবাহিত।

কিছুদিন পরই আমাদের বক্সাদুর্গে বদলীর আদেশ এল। কিন্তু এর মাঝেই আমার কালাজ্বর আবার জোরসে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই জেল সুপার মেজর সিংএর সুপারিশে আমার বক্সা-যাত্রা স্থগিত রইল। পর পর তিনবার আদেশ এসে ফিরে গেল। কিছুদিন আগেই বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে আমার একটী মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। বাহিরে প্রকাশ না করলেও প্রথম সন্তানকে দেখার আগ্রহ মনে অস্বস্তির ভাব এনেছে। খবর পেলাম দাদা এসেছেন আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে।

কিছুদিনের মধ্যেই হ'ল "Gandhi-Irwin-Pact"। সত্যাগ্রহী বন্দীরা মুক্তি পেলেন। দাদাও বাহিরে গেলেন। পড়ে রইলাম আমরা - বিপ্লবী রাজবন্দীরা।

কিন্তু এই সময় থেকেই আমাদের সম্বন্ধেও সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটে। ধীরে ধীরে রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হতে লাগল। প্রায় দেড়বছর পরে স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ নিয়ে আমি বাহিরে এলাম। প্রেসিডেন্সী জেলের রাজবন্দী মহলে রাজসাহীর প্রতিনিধিত্বের ভার দিয়ে এলাম কেষ্ট চাটুয্যের হাতে।

* * * *

সন্ধ্যায় রাজসাহী থেকে গ্রামে ফিরলাম। দাদার নেতৃত্বে গ্রামের ছেলেরা রেল ষ্টেশনে সম্বর্ধনা জানিয়ে শোভাযাত্রা করে বাড়ী পৌছে

দিল। কোলকাতার আই, বি অফিসর প্রাতেই ফিরে গেলেন। আবির্ভূত হলেন রাজসাহীর আই, বি ইন্‌স্পেক্টর শ্রীনীরোদ মুখার্জি। কুশল প্রশ্নাদির পর ফিরতি ট্রেনেই তিনি রাজসাহী চলে গেলেন।

দলের বন্ধুরা এইবার দলে দলে আসতে লাগলেন। কেউ কেউ ধরা পড়ে ইতিমধ্যেই জেলে গিয়েছেন। তবুও অনেকেই বাহিরে আছেন তখনও।

ক্ষিতীশ দেব এল। কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে দু' তিনদিন পর চলে গেল। তার পরই দেখা পেলাম আশুদা'র। তিনি তখনও আত্মগোপন করে আছেন—ধরা পড়েন নি। রমেশদা'র সুদীর্ঘ সাঙ্কেতিক লিপি তাঁর হাতে দিলাম। তাঁর কাছে দলের অবস্থার কথা শুনলাম। গোপন পথে আরও চলার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলাম। দেখলাম আশুদার নিষ্ঠা তখনও অচঞ্চল—মতামতে নট্ নড়ন-চড়ন।

প্রায় আট মাসে পরে—জেলার মধ্যে সর্তাধীনে ঘোরা-ফেরার আদেশ পেলাম। মাসে একদিন পুঠিয়া থানায় হাজিরা দিতে হ'ত। এই সময় থানায় শ্রীযুক্ত গোপাল নিয়োগীর সাথে আলাপ হয়। তিনি পুঠিয়া থানায় অন্তরীণ ছিলেন। শান্ত, ভদ্র, বিদ্বান ব্যক্তি। এখন বোধ হয় 'বসুমতীর' সম্পাদকীয় বিভাগে আছেন।

ম্যানেজারের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে আবার রাজার চাকুরীতে প্রবেশ করলাম। থাকতে হত রাজসাহীতে। অতিশয় সতর্কতার সাথে দলের কাজ চালাই। বাছা বাছা কয়েকটী বন্ধু ব্যতীত সকলের সাথে আলাপ-আলোচনা বন্ধ করেছি। এই সময়ই পাকশীতে রেল কোম্পানীর টাকা লুট করার আয়োজন করা হয়। বিজন সেন খবর দেয় প্রতি মাসের প্রথমে রেলকর্মচারীদের বেতন দিবার জন্যে পাকশী থেকে ঈশ্বরদিতে ট্রলিতে টাকা আসে। এই টাকা ছিনিয়ে

নিতে হবে। পাকশীতে বিজনেব চেষ্টায একটা দল গড়ে উঠেছে। কয়েকটী সাহসী ছেলেও আছে।

আমাব পরামর্শ মত এই কাজের ভার নিয়ে বিজনের সাথে চেরু গেল পাকশীতে। সব ব্যবস্থা করে এসে জানালো বহরমপুব থেকে শ্রীত্রিদিব চৌধুবী ওবফে টাকুবাবুও একজন বন্ধু সহ এই কাজেব জন্যে পাকশী এসেছেন। নির্দিষ্ট দিনে চেরু ও বিজন বওনা হয়ে গেল রিভলভার নিযে। কিন্তু দু'দিন পরই এসে জানালো—সংবাদ leak করেছে,—চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশের বিবাট বেড়াজাল থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে সকলে পালাতে সমর্থ হয়েছে।

এদিকে দাদা বুকুৎসায় বিরাট প্রজা আন্দোলন সুরু করেছেন। হিন্দু—মুসলমান অগণিত প্রজা তাঁব অনুগামী। তাদের দাবী নিয়ে তিনি রাজসাহীতে জনসভার আয়োজন করেছেন। সভার প্রাক্কালে পুলিশ তাঁকে আর চেরুকে গ্রেপ্তার করল। অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের জামীন পেলাম না।

প্রেসিডেন্সী জেলে এক চোরের কাছে শুনেছি। তারা দুই ভাই। দুজনই দাগী চোর। ফলে তাদের বরাতে বাড়ীতে একসাথে তে-রাত্রির বাসেরও সুযোগ মেলেনা। আমাদের দুই ভাইয়েরও অবস্থা ঠিক তাই। আমি জেলে - দাদা বাহিরে,—আবার দাদা জেলে—আমি বাহিরে।

এধারে দলের মধ্যে দলাদলি সুরু হয়েছে। ত্রৈলক্যর নেতৃত্বে দলের একটা মোটা অংশ বিদ্রোহ করেছে। একদিন ক্ষিতীশ উত্তেজিত ভাবে এসে বলল 'ত্রৈলক্যর দলের ছেলেরা আমাদের একটী ছেলেকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। দলের সংহতি রক্ষার জন্য এর সমুচিত জবাব দেয়া দরকার।'

—মোটেই না—আমি বললাম।

—তবে?

আমি জানালাম 'রাজসাহী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছে। জন-চিত্ত বিক্ষুব্ধ আর চঞ্চল হয়েছে এতে। এই সময় জেল সুপার লিউক সাহেবকে যদি সরাতে পার, জেলাবাসীর দৃষ্টিতে তোমরা যতখানি উঠবে—ত্রৈলক্য তার দলবল নিয়ে ঠিক ততখানিই নামবে। ত্রৈলক্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তাই ঠিক হল। লিউক সাহেবের মোটরের সামনে accident করে মোটর থামাতে হবে,—প্ল্যানের মোটামুটী ছবি আমি দিয়ে দিলাম। ক্ষিতীশ ও বন্ধুবর শ্রীপ্রভাত চক্রবর্তী কর্মীদের সাথে আলোচনায় প্ল্যানের details ঠিক করেছেন—প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই করেছেন। প্রভাত বাবু কিছুদিন পূর্বেই বক্সাবন্দীনিবাস থেকে পালিয়েছেন।

অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যায় জেলের পিছনের পথে লিউক সাহেব রিভলবারের গুলীতে আহত হলেন। চোয়াল সংলগ্ন কণ্ঠনালী এপার ওপার ভেদ করে চলে গেল গুলী। শহরের লোক চমকে উঠলো; আমি প্রমাদ গুণে তারা নাম জপ করতে থাকলাম। লিউক সাহেবকে আক্রমণের ভার ছিল দলের বিশ্বস্ত কর্মী সুধীর ভট্টাচার্য্য, প্রভাত রায় আর ভোলা রায়ের উপর। শেষের দুইজনই তারাদাসের চেলা।

এদের পৃষ্ঠরক্ষার ভার ছিল রাজসাহীর বাণী চক্রবর্তী আর দিনাজপুরের সত্যব্রত চক্রবর্তীর উপর। সত্যব্রতকেই কার্য্যকালীন নেতা বলা যেতে পারে। পুংখানুপুংখ ব্যবস্থাপনায়—সে ছিল ক্ষিতীশের প্রধান সহকারী।

এই আক্রমণে প্রভাত রায় যথেষ্ট সাহস আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। তারই নিক্ষিপ্ত গুলীতে লিউক আহত হয়।

শহর তোলপাড়। দলের প্রায় সত্তরটী কর্মী এই সম্পর্কে ধরা পড়ে। আক্রমণকারী দলের ভোলা রায় তাদের অন্যতম। কিন্তু অপর চারজন প্রভাত রায়, সত্যব্রত, বানী ও সুধীর রাজসাহী

থেকে পুঠিয়ার জ্ঞানাঞ্জন ওরফে আন্দু লাহিড়ীর সাহায্যে সরে পড়ে।

অবশেষে এক ভোলার বিরুদ্ধেই মামলা চলে এবং বিচারে তার সাত বছরের দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়।

বোধহয় এর কিছু পরেই শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার আর শ্রীবিমল চক্রবর্তীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। এদের দু'জনকেই বড্ড ভাল লাগত আমার। কলেজের ছাত্রমহলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এরা। এদের পূর্ববর্তী ছাত্রনেতা বীরেন দত্ত, সুবেন দাশগুপ্ত ও বীরু মামার চেষ্টায় রাজসাহী কলেজের ছাত্রমহলে আমাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সত্যেন আর বিমল সেই প্রভাবের সাথে যোগ করেছে সম্ভ্রম। বিমল আজ নামকরা এটর্নী—আর সত্যেন কম্যুনিষ্ট এম্, পি। জনতার সাথে মমতার সংযোগ আছে সত্যেনের।

আমি আজ এদের ভয় পাই,—বিশেষ করে এখনও যারা জনসেবার ব্রতে লিপ্ত আছে। পথের বাঁকে বাঁকে শত শত নিঃস্বার্থ কর্মীর সাথে পরিচিত হয়েছি, শ্রদ্ধার সাথে বহুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে একদিন বহুর শ্রদ্ধা পেয়েছি; কিন্তু আজ আমি তার ছায়া। মন আছে—মানুষ নাই, চিত্ত আছে—সামর্থ্য নাই। তা'ই একদিন যারা আমার অতিপ্রিয় সহকর্মী ছিল তাদের কেউ যখন আজের আমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরায়, অতীতের কংকাল বলে উপহাস করে—আমি তখন সহজভাবে চলতে পারি। কিন্তু এখনও যারা শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেয় অন্তরের উপচারে,—তারাই আমাকে সংকুচিত করে। মনে হয় আমি প্রবঞ্চক,—অতীতে যে মানুষটাকে সকলে শ্রদ্ধা জানাতো সে তো আর বেঁচে নাই! তবু মনে আনন্দ পাই এই ভেবে যে অতীতকে এখনও অনেকে ভোলে নি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিশ্লেষণে এখনও তাঁরা বিশ্বাস করেন অতীতের বনিয়াদের উপরই দাঁড়িয়েছে বর্তমান,—আবার বর্তমানই করবে ভবিষ্যতের জন্মদান। তাই তাঁরা জাতির জীবনেতিহাসের একটী অধ্যায়ে গেঁথে রাখতে চান অতীত দিনের রক্তঝরা পথের পরিচয়।

অনেকে বলেন ভ্রান্ত ছিল আমাদের পথ। কিন্তু অভ্রান্ত পথের সন্ধান আজও কি মিলেছে? মত ও পথ পিছে রেখে কাল চলে এগিয়ে,— আসে নূতনের বার্তা নিয়ে। এই চলার পথে আছে ভুল,—আছে ভ্রান্তি। তাই নিয়েই অগ্রগতি। ভুল বলে এই গতিকে অস্বীকার করতে হ'লে অস্বীকার করতে হয় জীবনের ভিত্তিকে,—আজের আমিকেও। প্রেরণার উৎস যাই হো'ক প্রেম, নিষ্ঠা, শুভ্রতা, দৃঢ়তা, কর্মোৎসাহ আর আত্মত্যাগ মত ও পথের উর্ধে,—সর্বকাল জয়ী। অনন্তকাল ধরে অন্ধকারে তারা জ্বলে আপন মহিমায়। যুগযুগান্তের মানবতা তাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানায়। সেই শ্রদ্ধাধারার এককণা এই পথের পরিচয়।

—সমাপ্ত—